তত্ত্বোপদেশ-সংগ্রহ।

ময়মনসিংহস্থ

গবর্ণমেণ্ট বঙ্গবিদ্যালযের শিক্ষক

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র গুহ কর্ত্তৃক

সঙ্কলিত।

কলিকাতা

সুচারু-যন্ত্রে শ্রীলালচাঁদ বিশ্বাস এণ্ড কোং কর্ত্তৃক
বাহির মৃজাপুর ১৩ সংখ্যক ভবনে মুদ্রিত।

১২৭১। ১৮৬৩।

[মূল্য। আট আনা মাত্র।]

ভূমিকা।

এসময়ে অনেক সুধীবর দেশহিতৈষী বিজ্ঞ মহাশয়েরা ইংরাজী, সংস্কৃত, পারস্য প্রভৃতি বহুবিধ ভাষা হইতে বঙ্গভাষায় ধর্ম্মনীতি-সম্পন্ন বিবিধ পুস্তকের অনুবাদ করিয়া প্রচার দ্বারা এবং কোন কোন মহাশয় স্বীয় মানসোদিত অভিনব গ্রন্থনিচয় রচনা পূর্ব্বক মাতৃভাষার ভূয়সী শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতেছেন। কিন্তু আমার এতদুভয়ের কোন ক্ষমতাই নাই, অথচ সেই পদবীতে পদার্পণ করারও নিতান্ত মানস।

অত্যুন্নত পুরুষ-প্রাপ্য ফল পাওয়ার জন্য বামন হস্ত প্রসারিত করিলে সে যেমন সেই ফলাশায় নিরাশ ও উপহাসাস্পদ হয়, আমিও তদনুরূপ হইব; তাহার সন্দেহ নাই।

এই গ্রন্থে মদ্রচিত কোন অভিনব রচনা অথবা ভাব কিছুই নাই। সুপ্রসিদ্ধ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা এবং ষট্‌ত্রিংশ ব্যাখ্যান হইতে কলিকাতাস্থ ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদ-

শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের ১৭৮৪ শকের ১০ জ্যৈষ্ঠের লিখিত পত্রের সম্মতি অনুসারে ধর্ম্মশিক্ষা, সত্য ব্যবহার, নি-কৃষ্ট প্রবৃত্তি সকলকে বশীভূত রাখা কর্ত্তব্য বিষয়ক প্রস্তাবত্রয় এবং অত্রস্থ ব্রাহ্মসমাজে পঠিত কোন মহানুভব মহাশয়-প্রণীত ঈশ্বরের অস্তিত্ববোধ স্বতঃসিদ্ধ, আত্মার অস্তিত্ব বিষয়ক প্রস্তাবদ্বয় লইয়া এই পুস্তক খানি সঙ্কলিত হইল।

আমি তত্ত্ববোধিনী ও ময়মনসিংহস্থ ব্রাহ্ম-সমাজের এই চিরস্মরণীয় উপকার স্মরণার্থে এই পুস্তকের দ্বারা আমার যে কিছু লাভ হই-বেক, তাহার ৶০ দুই আনা অংশ কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজে এবং ৶ দুই আনা অংশ ময়মন-সিংহস্থ ব্রাহ্মসমাজে দান করিলাম।

পরিশেষে কৃতজ্ঞতা পূর্ব্বক স্বীকার করি-তেছি যে ময়মনসিংহস্থ বিদ্যালয় সমূহের ডিপুটী তত্ত্বাবধারক শ্রীযুক্ত বাবু বৈকুণ্ঠনাথ সেন মহাশয় এবং আমার পরম বান্ধব ইংরাজী বিদ্যালয়ের শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু কালীকুমার

গুহ প্রভৃতি মহাশয়গণ এই গ্রন্থ সঙ্কলন করাব বিষয়ে পরামর্শ দিয়াছেন, তাঁহাদের এবং অ-ত্রস্থ গবর্ণমেণ্ট বঙ্গবিদ্যালযেব সচ্চরিত্র ছাত্রদের পূর্ব্বোক্ত প্রস্তাবগুলি পাঠে প্রবৃত্তি এবং উৎ-সাহ দেখিয়াই আমি এগ্রন্থ সঙ্কলিত করিয়া মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিলাম। ছত্রপুব দাপুনিয়া স্কুলের সর্কল পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বাবু ঈশানচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এই গ্রন্থ সঙ্কলন বিষযে আমার অনেক সাহায্য করিয়াছেন। এই পুস্তকের দ্বারা যদ্যপি এক জনের মনে কিছু মাত্রও ধর্ম্মনীতি শিক্ষায় অনুবাগ জন্মে, তবেই আমার শ্রম এবং পুস্তক মুদ্রাঙ্কণের ব্যয় সফল বিবেচনা করিব।

১৭৮৬ শক
২১ শ্রাবণ
ময়মন সিংহ

গ্রন্থসঙ্কলনকারকস্য।

তত্ত্বোপদেশ-সংগ্রহ।

ঈশ্বরের সত্তাবোধ স্বভাবসিদ্ধ।

মনুষ্য-সমাজে সময়ে সময়ে পরমেশ্বরের সত্তা যুক্তি দ্বারা নিরূপণ করার বহু বহু চেষ্টা হইয়াছে এবং যে যে মহাত্মা কোন কালে এ বিষয়ে যত্নশীল হইয়াছিলেন, তিনিই এক মাত্র প্রসিদ্ধ মতের অনুগামী হইয়া বিচার করিয়াছিলেন। যুনানী দেশস্থ সুপ্রসিদ্ধ সক্রাট্ নামক ধর্ম্ম-প্রযোজক মহানুভব অস্মদ্দেশস্থ মহামান্য তার্কিক পণ্ডিতমণ্ডলী অধুনা সভ্য দেশ নিচয়ে বিখ্যাত নৈসর্গিক ধর্ম্মবিৎ পণ্ডিতগণ সকলেই এতদ্বিষয়ের এক পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছেন। অথচ ইহাঁরা যে একে অন্যের অনুগামী হইয়া এরূপাচরণ করিয়াছেন এমতও নহে, কারণ কেহ কোন ধর্ম্ম বিষয় লিখিতে প্রবৃত্ত হইলে তাঁহার মনে স্বভাবতঃ এমত একটি অভিলাষ জন্মে, যে এতদ্বিষয়ে অন্যে যাহা প্রকাশ না করিয়াছে তাহাই প্রকাশ করিব, কেবল মনে ইচ্ছামাত্র উদিত হয় এমত নহে, এতৎ অভিপ্রায়ে সমধিক যত্ন ও প্রয়াস পাইয়া থাকেন। অতএব এই প্রকার

বিবিধ অসামান্য ধীশক্তি-সম্পন্ন ব্যক্তিব্যূহের নূতন নূতন প্রমাণ প্রাপণ বিষয়ক গবেষণা দ্বারা যদি কেবল মাত্র একটি প্রমাণই গ্রাহ্য হয়, তখন আর ঐ প্রমাণের যাথার্থ্য বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে না, কারণ তাঁহাদের বিবিধ চেষ্টা দ্বারা ঐ সিদ্ধান্তটি অন্যবিধ প্রকার সপ্রমাণ করিবার সম্ভাবনা থাকা নিরাকৃত হউক বা না হউক, অবশ্য অবধারিত হয় যে, উদ্ধৃত প্রমাণ সর্ব্বাঙ্গ-পরিশুদ্ধ দোষবিহীন, তাহাতে কোন দোষের আশঙ্কা থাকিলে একের না একের প্রযত্নে তাহা উদ্ভাবিত হইত।

ইহার দ্বারা এমত কিছু স্বীকার করা হইতেছে না,-যে, পরমেশ্বরের সত্তা বিষয়ে এক মাত্র প্রমাণ ভিন্ন অন্য প্রমাণ পাওয়া যায় না। পশ্চাতে যাহা প্রদর্শিত হইবে তাহার মুখ্য অভিপ্রায় এই, যে উল্লিখিত পণ্ডিতগণ যে প্রমাণ গ্রহণ করিয়া গিয়াছেন, তদ্ব্যতীত আর একটি প্রধান প্রমাণ আছে, তাহাও অখণ্ড ও সর্ব্বাঙ্গ পরিশুদ্ধ যুক্তিমূলক বটে। তবে যে তাহা এপর্য্যন্ত সম্যক্ রূপে পরিগৃহীত হয় নাই, তাহার কারণ এই যে সকল পণ্ডিতগণের "মনোবিজ্ঞান" শাস্ত্রে সম্যকরূপে অধিকার বা দৃষ্টি নাই, অথবা তদ্বিষয়ক নিয়ম সকল মনোনিবেশ পূর্ব্বক বিবেচনা করেন না, করিলে তদ্দ্বারা এমন সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়, যে তাহার যাথার্থ্য বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে না। পশ্চাৎ ইহাও প্রদ-

র্শিত হইবে যে প্রমাণটি তাঁহারা গ্রহণ করিয়া গিয়াছেন, তাহা প্রামাণ্য ও মনোবিজ্ঞান শাস্ত্র-সম্মত বটে।

ঐ সকল পণ্ডিতগণ পরমেশ্বরের সত্তা সপ্রমাণ করিবার উদ্দেশে নিম্নলিখিত যুক্তি অবলম্বন করেন। সৃষ্ট বস্তু দ্বারাই স্রষ্টার সদ্ভাব প্রমাণ হয়, কারণ কর্ম্ম সকর্তৃক অর্থাৎ কর্তা সহিত বর্তমান। এই সিদ্ধান্ত যুক্তিসিদ্ধ, কিন্তু প্রথমাবধি মানবগণের পরমেশ্বরেতে বিশ্বাস এই যুক্তি দ্বারা হইয়াছে এমত বিশ্বাস করা যাইতে পারে না, এবং যে সকল প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহা এইরূপ কল্পনাকে খণ্ডন করিয়া দেয়। পুরাবৃত্ত পাঠে ইহা অবধারিত হয়, যে মানবজাতি যে সময়ে সমাজবদ্ধ হইয়া কোন গ্রাম নগরাদি পত্তন করিয়া বাস করিতে শিক্ষা করে নাই, যৎকালে তাহারা বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্তাবস্থায় অরণ্যে অরণ্যে ভ্রমণ করিয়া কাল হরণ করিত; তৎকালেও তাহারা সেই অরণ্য মধ্যে আপন আপন প্রত্যয় ও জ্ঞানানুসারে জগৎকর্ত্তার উপাসনা করিতে নিযুক্ত ছিল। পরে যখন সামাজিক উন্নতি প্রাপ্ত হইয়া একত্র সমাজ-বদ্ধ হইয়া বাস করিতে আরম্ভ করিল ও নানা শিল্পকৌশল অবগত হইয়া অপূর্ব্ব গৃহমন্দির ও অট্টালিকাদি নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিল, তখন তাহারা পরমার্থ সাধনেরও বিশেষ স্থান প্রস্তুত করিয়া তথায় জগদীশ্বরের অর্চনা করিতে লাগিল। মনুষ্য যখন যে অবস্থায়

কাল যাপন করিয়াছে, তখন সেই রূপেই ঈশ্বরের আরাধনা করিয়াছে, পরিণামে যেমন অবস্থায় অবস্থিত হইবে সেই রূপেই তাঁহার অর্চনা করিবে। ঈশ্বরের আরাধনা মানবের প্রকৃতি-সিদ্ধ, উহা মনুষ্যের অজ্ঞানভাব কার্য্য নহে। মনুষ্যের অবস্থা বিশেষে ঈশ্বরের আরাধনার পদ্ধতি ভেদ হওয়ার সম্ভব; কিন্তু কোন কালে উহা মনুষ্য-সমাজ হইতে বিলুপ্ত হইবে না। আমরা বিলক্ষণ দেখিতেছি যে, জ্ঞানোন্নতি সহকারে যেমন মানব জাতির সামাজিক ও শারীরিক প্রভৃতি অন্যান্য বিষয়ের প্রকার ভেদ ও উন্নতি হইতেছে, সেইরূপ উহার ঈশ্বর-উপাসনা বিষয়ের পদ্ধতি ভেদে উন্নতি সিদ্ধ হইয়া আসিতেছে। অতএব জ্ঞান-পরিপাক দ্বারা পরিণামেও যে মনুষ্য-সমাজে জগদীশ্বরের উপাসনার কেবল রূপান্তর হইয়া উন্নতি হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। মনুষ্য আদিম অবস্থাতে অতি অসভ্য ও পশুবৎ বুদ্ধিহীন ছিল, বর্ত্তমান কালে যে সকল অসভ্য জাতি বর্ত্তমান আছে এবং যাহাদের অবস্থার যথার্থ বিবরণ অস্মদাদির হস্তগত হইয়াছে, তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে তদবস্থার মানবের বুদ্ধিবৃত্তি যেরূপ উৎকর্ষ হইতে পারে, তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায়। এইরূপ অসভ্য জাতি সকলের বিবরণ নানা স্থানে পাওয়া যাইতে পারে।

সুবিখ্যাত নাবিক কাপ্তান কুক সাহেব তাঁহার ভ্রমণ

বৃত্তান্ত মধ্যে এক স্থানে যাহা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল।

নিউজীলণ্ড হইতে মৈত্রক দ্বীপমালায় গমন কালে ওটাও নামে এক ক্ষুদ্র দ্বীপে তিনি উপস্থিত হন, তথাকার মনুষ্যেরা অবিকল পশুর ন্যায় অসভ্য, তাহারা ছাগ-মেষাদি জন্তু অবলোকন পূর্ব্বক উহাদিগকে পক্ষী বিশেষ জ্ঞান করিয়াছিল। কুক সাহেব লিখেন, ছাগ মেষাদিকে পক্ষী বলিয়া ভ্রম হওয়া সামান্য অজ্ঞতার কর্ম্ম নহে, বরং ইহা অসম্ভব বোধ হইতে পারে। কিন্তু এই সকল ব্যক্তিরা শূকর ও কুকুর ভিন্ন পশু আর কিছুই অবলোকন করে নাই। এমত নিকৃষ্ট অবস্থাতে মনুষ্যেরা যে পরমেশ্বরের সত্তা যুক্তি দ্বারা নিরূপণ করিতে সমর্থ হইবে ইহা সম্ভব বোধ হয় না, এবং ঈশ্বর-সত্তা প্রতিবাদক যুক্তি ভালরূপ বুঝাইয়া দিলেও তাহাতে প্রতীত হয় কি না সন্দেহ স্থল। অনেকেই এরূপ প্রশ্ন করিতে পারেন, তদবস্থাতেও পরমেশ্বরের সত্তাতে মনুষ্যের আস্থা বা অপেক্ষাকৃত অপকৃষ্ট ধর্ম্মে বিশ্বাস ছিল এবং পরমেশ্বরের উদ্দেশে ক্রিয়া কলাপের অনুষ্ঠান ছিল, ইহার ভূরি ভূরি অখণ্ডনীয় প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। এই জিজ্ঞাসার উত্তর অতি সহজ নহে, ইহার সদুত্তর না পাইয়া অনেকানেক জাতীয় মনুষ্যেরা কল্পনা করিয়াছেন, যে স্বয়ং পরমেশ্বর কোন কোন সাধু মনুষ্যকে ঈশ্বর-সত্তা-বিষয়ক উপদেশ

প্রদান করেন, ঐ সকল উপদেশ লিপিবদ্ধ হইয়া লোকসমাজে ধর্ম্মের বীজ স্বরূপ হইয়াছে।

অনেকে কহেন যে মনুষ্য গুরু-পরম্পরার নিকট শ্রবণ করিয়া জগদীশ্বরের জ্ঞানলাভ করিয়াছে, এই বাক্যটি যুক্তিযুক্ত নহে, কেন না যে ব্যক্তি প্রথমে ঈশ্বর-উপাসনা করিয়াছিল, তাহার বিশ্বাস কোথা হইতে হইল। এই সিদ্ধান্ত যুক্তিসিদ্ধ হউক বা না হউক, অনেক লোকে ইহাতে বিশ্বাস করিয়া আসিতেছে। খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিরা বিশ্বাস করেন, যে পরমেশ্বর মুসা নামক ইহুদীয় ধর্ম্ম-প্রযোজককে ককেশস্ পর্ব্বতোপরি ধর্ম্ম উপদেশ দেন। অস্মদাদির মধ্যেও বিশ্বাস আছে, যে স্বয়ং ব্রহ্মা বেদশাস্ত্র ভগবান মনুকে প্রদান করেন। এই সকল কল্পনা ভ্রমাত্মক, ইহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য এ স্থানে অধিক প্রয়াস পাইবার আবশ্যক রাখে না। কেবল মাত্র ইহাই বাচ্য, যে বিশ্বরচনা বিষয়ে বিশ্বপাতার যেরূপ সুচারু অলৌকিক কৌশল ও শক্তি প্রদর্শিত হইতেছে, তাহার সহিত এই কল্পনাটির সামঞ্জস্য হইতেছে না। আমরা মনোগত ভাব প্রকাশ করিবার অভিলাষ করিলে অন্যের কর্ণ কুহরে শব্দের প্রতিঘাত দ্বারাই ব্যক্ত করি। সেইরূপ আমাদের স্বকপোল-কল্পিত বুদ্ধি দ্বারা গ্রহ কি উপগ্রহ বিশেষকে শূন্যে সংস্থাপিত চিন্তা করিতে হইলে, তাহার অধোভাগে কোন অবলম্বক দণ্ডের

সংযোজনা অথবা তাহা রজ্জুনিবদ্ধ করিয়া দোলায়মান করিবার কল্পনা অথবা এতদ্রূপ কোন চিন্তা আমাদের চিত্তক্ষেত্রে উদিত হয়। কিন্তু এই সকল কল্পনার সহিত পরমেশ্বরের কার্য্যের যেরূপ সাম্য দৃষ্টি হয় না, তদ্রূপ আমাদের মনোগত ভাব প্রকাশের পদ্ধতি দ্বারাও তাঁহার অভিপ্রায় প্রচারের প্রণালী অনুভূত হইতে পারে না। যে বিশ্বপাতা বাক্য-প্রয়োগ ব্যতীত প্রকৃতির সমুদয় নিয়ম সঙ্কেতে অস্মদাদির বোধগম্য করিয়া দিয়াছেন, যিনি কার্য্য কারণের সম্বন্ধ নিরূপণ করিয়, প্রপঞ্চ বিশ্বশাসন করিতেছেন, তিনি যে এতদ্বিষয়ের জন্য তাঁহার বিশ্বমান্য নিয়মের বিরুদ্ধ মতাবলম্বন করিবেন, ইহা নিরপেক্ষ বিবেচনায় কোন প্রকার যুক্তিসিদ্ধ বোধ হয় না। এই সিদ্ধান্তটি যে অপরোক্ষদর্শী অনভিজ্ঞ মনের বিনির্ম্মিত, তাহা সৃষ্টি-প্রণালী প্রতি দৃষ্টি করিলেই প্রতীয়মান হইবেক।

বিশেষতঃ পরমেশ্বরের আজ্ঞা সকল সময়ে সকল জাতীয় মনুষ্যের পক্ষেই সমানরূপে প্রযোজনীয়, তাহা প্রতিপালন করা যখন সকলের পক্ষে ঐহিক পারত্রিক সুখের মূলীভূত, বিশ্বনিয়ন্তা কোন বিশেষ জাতিকে অনুগ্রহ পাত্র করিবেন, অন্য সকল মনুষ্য তাঁহার অনুগ্রহ প্রাপ্তিতে বঞ্চিত থাকিবে, ইহা কদাপি যুক্তিসিদ্ধ বোধ হয় না। তিনি যদি অস্মদাদির ন্যায় পক্ষপাতী হইতেন, তাহা হইলে এতদ্রূপ কল্পনা সুসঙ্গত হইতে

পারিত। সুতরাং ইহার দ্বারা পরমেশ্বরের সত্তা বিষয়ক দুইটি সিদ্ধান্ত অপ্রমাণ্য হইল। প্রথম এই পরিজ্ঞান যুক্তি দ্বারা হইয়াছে এমতও বলা যায় না, কারণ এতদ্বিষয়ে যে পরিমাণ বুদ্ধির উৎকর্ষতা আবশ্যক হয়, মনুষ্যদিগের আদিমাবস্থাতে তাহা সম্ভবে না। দ্বিতীয় ঐশ্বরিক উপদেশ দ্বারা হইয়াছে, তাহাও স্বীকার করা একপ মীমাংসা অযৌক্তিক ও অবাস্তবিক বোধ হইতেছে। অতএব ইহা সৃষ্টির অব্যবহিত কালাবধি প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। অতএব কিরূপে এই বিশ্বাস অভিভূত হইল, সূক্ষ্ম রূপ বিবেচনা করিয়া দেখিলে প্রতীত হইবে। পরমেশ্বরে আস্থা অস্মাদাদির স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম। কেবল মাত্র অকলুষিত পবিশুদ্ধ আত্মার প্রত্যক্ষ সত্তা দ্বারা প্রতীয়মান হইয়া থাকে, পরমেশ্বরে বিশ্বাস অস্মদাদির স্বভাবসিদ্ধ সংস্কারমূলক; এবম্বিধ উত্তরে অনেকেই প্রতীত হইবেন না, ইহা অনায়াসে বোধগম্য করা যাইতে পারে। অনেকে এরূপ আপত্তি করিতে পারেন, যে আমরা সংস্কারকে যুক্তি দ্বারা পরীক্ষা করিয়া তাহা সুসঙ্গত কি না, বিবেচনা করিয়া থাকি। কিন্তু সংস্কার আছে বলিয়া তাহা বিশ্বাস জন্মে এমত স্বীকার করা ন্যায়সম্মত বোধ হয় না। আর এই সিদ্ধান্ত স্বীকার করিলে ন্যায় ও অন্যায় সংস্কারেও বিশ্বাস বলিয়া কোন ইতর বিশেষ থাকে না।

মানব-সমাজে নানা প্রকার ধর্ম্ম প্রচলিত হইয়া আসিতেছে, তাহার সকলই সংস্কারমূলক, অতএব কেবল যদি সংস্কারই কোন বিশেষ বিষয়ে যাথার্থের প্রমাণরূপে গণ্য হয়, তাহা হইলে কোন্ ধর্ম্ম অলীক কোন্ ধর্ম্ম বাস্তবিক তাহা নিরূপণ করা দুরূহ হইবেক। এই আপত্তি যে অলীক তাহা বোধগম্য অনায়াসেই করা যাইতে পারে। সকল প্রকার সংস্কারই যে যুক্তিসম্মত ও বিশ্বাসভূমি ইহা স্বীকার করা যায় না। কিন্তু যে সকল সংস্কার স্বভাবসিদ্ধ, তাহাতে অবিশ্বাস করার সাধ্য নাই, ইহা পশ্চাৎ প্রদর্শিত হইবেক। পরমেশ্বরের সত্তাতে বিশ্বাস মানব-প্রকৃতি-মূলক ও মনের স্বভাবিক ধর্ম্ম। তাহা অগ্রাহ্য করার কোন কারণ অনুভব করা যায় না। কোন বিশেষ এক ব্যক্তির বিশ্বাস আছে বলিয়া তাহা যথার্থ হইতে পারে না। কিন্তু যখন মানব মাত্রেরই একই বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস আছে দৃষ্টি করা যাইতেছে, তখন সেই বিশ্বাস যে প্রকৃতিমূলক ও যথার্থ, তাহার সন্দেহ মাত্র থাকে না। অন্যান্য বিষয়ে তাহাদের অভিপ্রায়ের যতই অনৈক্য হয়, এতদ্বিষয়ের ঐক্যতা ততই আশ্চর্য্য বোধ হইবে, এবং তদ্দ্বারা একটি প্রাকৃতিক নিয়ম অনুভূত হইবে। নানাবিধ গুণে একরূপ ফল প্রত্যক্ষ করিয়া প্রকৃতির সাধারণ নিয়ম সকল অবধারিত হয়।

গুরুত্ব বিষয়ে একটি সাধারণ নিয়ম আছে, তাহা এ

প্রণালীতে ধার্য্য হইয়াছে, তাহা এই ফল ফুল পত্রাদি স্খলিত হইয়া আপনিই ভূতলে পতিত হয়, সেরূপ হস্ত হইতে পুস্তক অথবা ইষ্টকাদি ত্যক্ত হইলেও ভূপৃষ্ঠে পতিত হয় এইসকল বস্তু নানা আকার বিশিষ্ট ও নানাবিধ উপাদানে নির্ম্মিত, কোন বস্তু বা গোল অথবা চতুষ্কোণ কেহ বা শ্বেত কেহ বা লোহিত, এবং তাহাদের পতনের অবস্থা নানারূপ হইতে পারে, কেহ বা ঠিক সমভাবে পতিত হইতেছে, কেহ বা নির্দ্দিষ্ট শক্তি সহকারে বিশেষ গতিতে পরিচালিত হইয়া পশ্চাতে বক্র-রেখায় অবনত হইতেছে। এই প্রকার বস্তুর ও অবস্থার আশ্চর্য্য শক্তি-সত্ত্বে ভূপতন রূপ একটি সাধারণ ফল প্রত্যক্ষ হইতেছে, ইহাই গুরুত্ব বিষয়ক সাধারণ নিয়ম। সেইরূপ পৃথিবীর মধ্যে নানা প্রকার ধর্ম্ম বিশ্বাস প্রচলিত হইয়া আসিতেছে, দুই জাতীয় লোকের ধর্ম্মবিষয়ক মতের ঐক্যতা প্রাপ্ত হওয়া সুকঠিন। তাহারা প্রায় সকলে যদিও বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন, তথাচ এইরূপ পরস্পর বিরুদ্ধতা-সত্ত্বেও এক বিষয়ে ঐক্যতা দৃষ্টি হয়। সকলেই পরমেশ্বরের সত্তা স্বীকার করে, সকলেই একবাক্য হইয়া ঈশ্বর-সত্তার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

উদ্ধৃত উদাহরণে নানা বস্তুর পতন দৃষ্টি করায় পতন বিষয়ক যেরূপ সাধারণ নিয়ম অবধারিত হইল, সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন স্বভাব-সিদ্ধ ব্যক্তি ব্যূহের পরমে-

শ্বরের অস্তিত্ব বিষয়ক বিশ্বাসের ঐক্যতা দৃষ্টে পরমেশ্বরের সত্তাতে বিশ্বাস যে আমাদের মনের সাধারণ ধর্ম্ম, এমত প্রতিপন্ন করা যুক্তিসিদ্ধ বোধ করা যাইতে পারে কি না? পৃথিবীমধ্যে প্রচলিত ধর্ম্ম সকল পৃথক্ পৃথক, কিন্তু এক মূল। পরমেশ্বরে বিশ্বাসই সেই মূল সূত্র; ইহার খণ্ডন হইলে কোন প্রকার ধর্ম্মই থাকে না। অতএব নাস্তিক সম্প্রদায় ব্যক্তিগণকে সকল প্রকার ধর্ম্মবাদীরা একত্র হইয়া নিরস্ত করিতে যে উদ্যত হয়েন, তাহার কারণ এই।

পরমেশ্বরে বিশ্বাস যখন স্বভাবসিদ্ধ বলিয়া অবধারিত হয়, তখন "কিরূপে এই বিশ্বাস হইল" এমত প্রশ্ন করা সুসঙ্গত হইতে পারে না, যে সকল বিষয় স্বভাবসিদ্ধ তৎপ্রতি বিশ্বাস বিষয়ে কোন কারণ প্রদর্শন করা যাইতে পারে না। দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহা স্পষ্টরূপ বোধগম্য হইবে।

সৃষ্টিকর্ত্তা আমাদিগকে পঞ্চভূত ও দশেন্দ্রিয় যোগে সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহার একের দ্বারা দর্শনপ্রত্যক্ষ হইতেছে। নেত্রযুগল উন্মীলিত করিলেই অন্তঃকরণে নানা প্রকার ভাবের উদয় হয়, অর্থাৎ বাহ্য বস্তুর সত্তা রূপাদি ভাবের উদ্রেক হইয়া থাকে, কিন্তু এই সকলের কারণ প্রদর্শন করিতে আমরা কি প্রকারে সমর্থ হইব। কেহ যদি একরূপ জিজ্ঞাসা করে যে "বাহ্য বস্তুর সত্তা বিশ্বাস করার কারণ কি?" এতদুত্তরে আমরা কেবল

ইহাই বলিতে পারি, যে সৃষ্টিকর্ত্তা আমাদিগকে এমত নিয়মে সৃষ্টি করিয়াছেন।

যে ইন্দ্রিয় দ্বারা অন্তঃকরণে বাহ্যবস্তু বিষয়ক কতকগুলি ভাব উদয় হয়, তাহাই বাহ্য বস্তুর সত্তা-প্রতিপাদক। তদ্দ্বারাই স্বভাবতঃ আমরা এই সকল বস্তুর অস্তিত্ব বিশ্বাস করিয়া আসিতেছি; কিন্তু এইরূপ পরিজ্ঞান যে ভ্রমাত্মক নহে, ঈদৃশ প্রত্যয় কেবল স্বভাব-সিদ্ধ সংস্কার-মূলক, এতদ্বিষয়ে কোন কারণ দর্শানর সাধ্য নাই, এই বিশ্বাস প্রামাণ্য যুক্তি দ্বারা কেহ প্রতিপন্ন করিতে সমর্থ হয়েন নাই. যাঁহারা এই সংস্কার অপ্রত্যয় করিয়া তাহা যুক্তি দ্বারা সংস্থাপন করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন, তাঁহারা কেবল এক বিতর্ক হইতে কুতর্কান্তে পতিত হইয়া স্ব স্ব অজ্ঞতা দেখাইয়াছেন মাত্র।

অতএব এই সকল বিশ্বাস পক্ষে মানব-প্রকৃতি যখন বলবৎ হেতু বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিল, তখন পরমেশ্বরের অস্তিত্ব বিষয়ক বিশ্বাসের কারণান্তর প্রাপ্ত হইবার চেষ্টাও নিরর্থক, সকল শাস্ত্রেরই কতকগুলি মূলসূত্র আছে, তাহারা স্বতঃসিদ্ধ। তাহাদিগকে বিচার দ্বারা প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে না, অথচ উহাদিগকে স্বীকার না করিলে অন্যান্য বিষয় বিচার দ্বারা অবধারিত হয় না, মনোবিজ্ঞান শাস্ত্র মধ্যে পরমেশ্বরের সত্তাতে বিশ্বাস এইরূপ স্বতঃসিদ্ধ একটি মূলসূত্র, অন্যান্য মূলসূত্রের ন্যায় ইহারা

উৎপত্তি বিষয়ক কোন কারণ দর্শান যায় না। ফলতঃ প্রথমাবধি অন্যান্য কতিপয় বিশ্বাসকে স্বভাব-সিদ্ধ মূল সূত্র মধ্যে গণ্য না করায় কেবল মাত্র একটি যুক্তি দ্বারা নিরূপণ করিতে অভিলাষ করি। এই সকল বিষয় যুক্তি দ্বারা নিরাকৃত হইলে অন্তঃকরণে তুষ্টি জন্মে, এবং বুদ্ধির উৎকর্ষতা বলিয়া অভিমান হয়, আর যে সকল বিষয় যুক্তি দ্বারা অবধারিত না হয়, তাহাতে আস্থা জন্মে না। বরং অযৌক্তিক বলিয়া হতাদর করিয়া থাকি, কিন্তু যুক্তি দ্বারা অতি অল্প বিষয়ের পরিজ্ঞান হয়, পদার্থ বিদ্যায় অধিক অধিকার না জন্মিলে ইহা জানা যায় না।

আমরা যে সকল বিষয় অবগত হইয়া জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছি, তাহার অতি অল্পাংশ কেবল যুক্তিমূলক, বিচার দ্বারা উদ্ভাবিত হইয়াছে। আর যে অল্পাংশ এইরূপে উদ্ভাবিত হইয়াছে, তাহার পরিজ্ঞান বিচার দ্বারা নিরাকরণ করিবার পূর্ব্বেই অনেক স্থলে কার্য্য করিতে বাধ্য হই, যুক্তিদ্বারা তাহার অবধানানন্তর তদনুযায়ী আচরণ করিব, এমত প্রত্যাশা করিতে হইলে সেই কার্য্য হইবার সম্ভাবনা থাকে না। বরং সেইরূপ করিতে হইলে অনিষ্ট ঘটিতে পারে, হয়ত জীবন রক্ষাই সুকঠিন হইয়া উঠে। মাতৃস্তনস্থ দুগ্ধ যে হিতকর, প্রাণরক্ষক ও পুষ্টিবর্দ্ধক তাহা যুক্তি দ্বারা অনুভূত হইতে পারে। কিন্তু সদ্যঃপ্রসূত শিশুর

যদি যুক্তি দ্বারা তাহার হিতাহিত গুণ অবধারণ করিয়া পশ্চাৎ দুগ্ধপান করিতে হইত, তাহা হইলে জীবন-রক্ষা পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। এই সকল স্থলে জীবেরা যুক্তির উপর নির্ভর না করিয়া স্বভাব-সিদ্ধ ঈশ্বর-প্রদত্ত পরিজ্ঞান অনুসারে আচরণ করিয়া বুভুক্ষা নিবারণ করিয়া থাকে, এতদ্বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিতে হয় না, এইরূপ অন্যান্য পরিজ্ঞানও যে স্বভাব-সিদ্ধ ইহার আশ্চর্য্য কি?

অপিচ প্রত্যক্ষ গোচর এমত অনেক বিষয় আছে, যে নিরপেক্ষ যুক্তিদ্বারা তাহার মর্ম্মভেদ করা যায় না, সেই সকল কার্য্য সর্ব্বদাই ঘটিতেছে। যুক্তি দ্বারা তাহার কারণ নির্দ্ধারণ করা কঠিন। পৃথিবী সৃষ্টির প্রথমাবধিই স্খলিত বস্তু সকল ভূপৃষ্ঠে পতিত হইতেছে। কিন্তু কিরূপ পতন ক্রিয়া ঘটিয়া থাকে আমরা তাহার কিছুই জানিতে পারি না। ইহাতে বিশেষ কোন কারণ আছে এমত বিশ্বাস না করিয়া নিরস্ত থাকার সাধ্য নাই। আমরা কেবল বিশ্বকর্ত্তার বিশ্বরূপ কার্য্য-গৃহের অভ্যন্তরে থাকিয়া সভয়-চিত্তে তাঁহার আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য কার্য্য সকল অবলোকন করিয়া অন্তঃকরণ চরিতার্থ করিতে পারি; কিন্তু তাঁহার ক্রিয়া-কৌশল ও নৈপুণ্যের মর্ম্ম ভেদ করা অস্মদাদির অসাধ্য। আমরা বাহ্য বস্তুর সত্তা বিশ্বাস করিয়া আসিতেছি। কিন্তু এই বিশ্বাস কি যুক্তির কার্য্য? নিরপেক্ষ যুক্তি দ্বারা

এই সকল বস্তুর সত্তা নিরূপণ করা যে দুঃসাধ্য এতদ্বি-ষয়ের চেষ্টা করিয়া দেখিলেই প্রত্যয় জন্মিবে, এই সকল স্থলে মনের স্বভাব-সিদ্ধ বিশ্বাসই প্রধান প্রমাণ, প্রমাণান্তরের সম্ভাবনা নাই। এইরূপ বিবেচনা দ্বারা যখন অবধারিত হয় যে আমরা যে সকল বিষয় বিশ্বাস করিয়া আসিতেছি, তাহার অল্পাংশ কেবল যুক্তিমূলক, তখন পরমেশ্বরের সত্তা স্বভাব-সিদ্ধ সংস্কার-মূলক যুক্তি দ্বারা অবধারিত হইল না বলিয়া অন্তঃকরণে আর ক্ষোভ জন্মিবে না। কিন্তু অনেকের এই বিশ্বাস যে স্বভাব-সিদ্ধ এমত স্বীকার করেন না, বরং কহিয়া থাকেন "ইহা যদি স্বতঃ-সিদ্ধ হইত, তাহা হইলে ঈশ্বর-সত্তা থাকিত না।" পূর্ব্বে যাহা প্রদর্শিত হইয়াছে, তদ্দ্বারাই এই বিশ্বাস যে স্বভাব-সিদ্ধ ইহা সপ্রমাণ করা গিয়াছে; তথাপি মনুষ্যগণ কিরূপে নাস্তিক হইতে পারে, এই বিষয়টি বিবেচনা করা উচিত।

আমরা যদি পৃথিবীর উত্তর দক্ষিণ ও পূর্ব্ব পশ্চিম এই চারিদিক প্রদক্ষিণ করিয়া মনুষ্য জাতির তত্ত্বানু-সন্ধান করি, তাহা হইলে দেখিতে পাই, যে কি বিজ্ঞ, কি বর্ব্বর, কি সভ্য, কি সুশিক্ষিত, কি অশিক্ষিত কি উপদিষ্ট কি অনুপদিষ্ট, সকল প্রকার লোকেই জগদীশ্বরের অস্তিত্ব বিশ্বাস করে, এবং কোন না কোন প্রকারে তাঁহাকে আরাধনা করিয়া থাকে।

কালে কালে ও দেশে দেশে এক এক জাতির এক এক

প্রকার দোষ দেখিতে পাওয়া যায়, এবং অনেক সময় অনেক জাতি এক এক প্রকার সাধারণ ভ্রমে ভ্রান্ত থাকে, কিন্তু কস্মিন্ কালেও কোন জাতির নাস্তিকতা দোষ সমুদায় দেশব্যাপী হইতে পারে নাই। উহা চিরকালই ব্যক্তিগত দোষ বলিয়া পরিচিত আছে। যখন কোন দেশে বা কোন কালে কোন কারণ বশতঃ কোনব্যক্তির মন বিকৃত বা বিভ্রান্ত হয়, অথবা যখন কোন ব্যক্তি আপনার যৎসামান্য জ্ঞানগর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়, বিশ্ববিরোধী অসাধারণ মহৎ পুরুষ বলিয়া পরিচিত হইবার মানসে বিশ্ব-প্রচলিত সাধারণ স্বতঃসিদ্ধ মত অস্বীকার করে, এবং আপনার অসাধারণ তর্ক, অনুপম বিচার-বল, অদ্বিতীয় বুদ্ধির প্রাখর্য্য দ্বারা সত্যকে আবরণ করিতে চাহে, মনঃকল্পিত অমূলক মত প্রচার করিতে ইচ্ছুক হয়। তখনই সে এই জগৎকে নিত্য ও অনুৎপন্ন বলিয়া স্বীকার করে, ও তখনি সে অন্য এক নিয়ম বা জড় পদার্থকে কৌশলময় কার্য্যের কারণ বলিয়া বল্পনা করে। কেহ সূর্য্যকে—কেহ স্বভাবকে—সৃষ্টির কারণ বলেন।

তাঁহাদের কি ভ্রান্তি! সূর্য্য কোথা হইতে হইল, কাহা হইতে এই উজ্জ্বল কিরণ পাইয়া সমস্ত জগৎকে উজ্জ্বল করিল, স্বভাব কোথা হইতে আপন এরূপ অপূর্ব্ব স্বভাব পাইল। নিয়ম থাকিলেই নিয়ন্তা আছে, নিয়ন্তা

না হইলে নিয়ম কি আপন হইতে হয়? এই ভাবটি কি মনুষ্য-মনে উদয় হইতে পারে?

স্বজাতীয় বস্তু হইতে স্বজাতীয়ের উৎপত্তি একথাটি প্রসিদ্ধই আছে। তবে জড়ময় সূর্য্য হইতে এই সুবিশাল বিচিত্র কৌশলময় বিশ্বের আশ্চর্য্য কার্য্য সংঘটন হওয়া কত দূর আশ্চর্য্যজনক! কত দূর অযৌক্তিক, তাহা অনায়াসেই প্রতীতি হইতে পারে।

কেহ বলেন মনুষ্য ঘটনা ক্রমে মৃত্তিকা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। এই অনুমান, উপমান, চিন্তা, দয়া, ভক্তি প্রভৃতি মনোবৃত্তিসম্পন্ন গৌরববিশিষ্ট মনুষ্য স্বভাবজাত বলিয়া কি মনুষ্য-মনে সায় দেয়! ইহা আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য! অযৌক্তিক বলিয়া সকলেই ঘৃণা ও অগ্রাহ্য অবশ্যই করিবেন, তদ্বিষয়ে অণু মাত্রও সন্দেহ করিতে পারি না। যিনি ক্ষুধার সহিত অন্নের, জলের সহিত পিপাসার, আলোকের সহ চক্ষুর, ঘ্রাণের সহিত নাসার, কামনার সহিত আশার, রসের সহিত রসনার, ভাবের সহিত ভাষার, শব্দের সহিত কর্ণের অপূর্ব্ব সম্বন্ধ নিবন্ধন করিয়া দিয়াছেন। যিনি মনুষ্যকে পৃথিবীর যোগ্য, পৃথিবীকে মনুষ্যের যোগ্য, জলকে মৎস্যের যোগ্য, মৎস্যকে জলের যোগ্য করিয়াছেন। যিনি ভাবী সুখ ও প্রয়োজন জানিয়া মাতৃগর্ভে অন্ধকার মধ্যে শরীরকে কর্ম্মঠ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। মাতৃস্তনে দুগ্ধের সৃষ্টি কি আশ্চর্য্য কৌশল!

কি দয়ার কার্য্য ! ইহা কি কোন অন্ধশক্তির কর্ম্ম ? যেমন চিত্রকর ব্যতীত কেবল বর্ণ ও তুলিকা সহযোগে কোন চিত্রময়-প্রতিরূপ চিত্রিত হওয়া,—স্থপতি ভিন্ন কেবল ইষ্টকাদি উপকরণে অট্টালিকা,—কুম্ভকার ভিন্ন কেবল কুলালচক্রে এবং মৃত্তিকাদি উপকরণে ঘট-উৎপত্তি,—কেবল মস্যাদি উপকরণে কোমল কবিতা রচিত হওয়া,—শিল্পকারভিন্ন বাষ্পীয় পোত, তাড়িত বার্ত্তাবহ, ঘটিকা যন্ত্র নির্ম্মাণ করা যেমন আশ্চর্য্য-জনক ও কল্পনা পথেও উদয় হয় না, তদ্রূপ এই শিল্প কৌশল-সম্পন্ন অবনী, এই অনন্তাকাশে চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্রের সৃষ্টি কি স্বভাবজাত বলিয়া মনে উদয় হইতে পারে ?—ইহা কখনই নহে, কখনই নহে।

কোন ব্যক্তি যদ্যপি পীড়াবশতঃ জিহ্বা দ্বারা সাধারণের যে সকল সুখানুভব হইয়া থাকে, তদ্বিষয়ে বঞ্চিত হয়, তদ্দ্বারা কি ইহা অনুভব করা উচিত, যে রসনা দ্বারা রসানুভব করা প্রাকৃতিক সাধারণ নিয়ম নহে, বরং ইহাই অনুমান করা যায়, যে তাহার রসনেন্দ্রিয় বিকল ও অসুস্থ হইয়াছে। সেইরূপ গবাদি পশু-শাবককে পঞ্চপদবিশিষ্ট হইয়া জন্ম গ্রহণ করিতে অবলোকন করিলে কি ইহা স্বভাব সিদ্ধ অনুভব করা উচিত ?

অতএব যদি যথার্থই পরমেশ্বরের অস্তিত্ব বিষয়ে কেহ অনাস্থা প্রকাশ করে, তবে ইহাই বলা যাইতে

পারে, যে সে ব্যক্তিও অসাধারণ নিয়মে অথবা উপাদানে বিনির্ম্মিত পঞ্চপদ গো, ও চতুষ্পদ মনুষ্যের ন্যায় অদ্ভুত সৃষ্টি মধ্যে গণ্য হইতে পারে। উপরোক্ত অদ্ভুত জীবদ্বয়ের ও তাহার মধ্যে এক মাত্র প্রভেদ এই, যে প্রোক্ত পশুদের নির্ম্মাণ বিষয়ক দোষ সকল দৃষ্টি গোচর হয়। বর্ণিত ব্যক্তির চিত্তে দোষ আছে, তাহা সেই রূপ সাধারণের প্রত্যক্ষ হয় না। কিন্তু জ্ঞাননেত্রের বিজ্ঞান-জ্যোতিতে অপ্রকাশিত থাকে না। আর যেমন সাধারণ নিয়ম দ্বারা তাহার মনের গতি ও ক্রিয়া যেরূপ বুঝা যাইতে পারে না, সেইরূপ তাহার মনোবিষয়ক নিয়ম দ্বারাও অন্যের মনের কার্য্য প্রকৃত কি অপ্রকৃত তাহা বিচার করা যুক্তিসিদ্ধ নহে। অতএব তাহার মনের সাক্ষ্যতার উপর নির্ভর করিয়া তাহার পক্ষে পরমেশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করা, যদি যৌক্তিক বোধ হয়, তাহা হইলে যাহাদের মনে পরমেশ্বরের সত্তা বিষয়ে বিশ্বাস জাগরূক রহিয়াছে, তাঁহাদের ঐ বিশ্বাস অনুরূপ আচরণ করার পক্ষে অধিক বলবৎ কারণ দেখা যাইতেছে। সেই বিশ্বাস সাধারণের মনের ভাবের সহিত ঐক্য হইতেছে। পশ্চাৎ ইহাও প্রদর্শিত হইবে, যে সকল নাস্তিকেরা পরমেশ্বরের সত্তা অস্বীকার করেন, তাঁহারাও কার্য্য যে কারণাভাবে হইতে পারে না, ইহা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা কেবল পরমেশ্বরকে সৃষ্টি বিষয়ের আদি কারণ

না বলিয়া অন্য কোন জড় পদার্থকে আদি কারন বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। তাহা যে নিতান্ত অযৌক্তিক ক্ষুদ্রমানস-কল্পিত বটে, তাহা পূর্ব্বেই প্রমাণ করা গিয়াছে।

অতএব ঈশ্বর-সত্তা বোধ যে স্বতঃ-সিদ্ধ নিতান্ত সত্য-মূলক এবিষয়ের আর সন্দেহ হইতে পারে না।

নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সকলকে বশীভূত রাখা আবশ্যক।

যখন প্রবল কাম ক্রোধাদি রিপুসকল বুদ্ধিকে পরাজয় করিয়, চক্ষুঃ শ্রোত্রাদি ও হস্ত পদাদি ইন্দ্রিয়গণকে আপনার অধীনে আনয়ন করে, তখন আমাদিগের যে কি পর্য্যন্ত অনিষ্টের সম্ভাবনা, তাহা ব্যক্ত করা সুকঠিন।

রিপুগণের মধ্যে কেবল ক্রোধের প্রবলতা হইলে আপনার ও পরের কি পর্য্যন্ত মন্দ হয়। যেমন, অগ্নি-সংযোগে লৌহ প্রভৃতি বিকার প্রাপ্ত হইয়া অন্য বস্তুকে দগ্ধ করে, তদ্রূপ ক্রোধ সংযোগে মনুষ্য বিকার বিশিষ্ট হইয়া অন্য লোকের অনিষ্ট করে। যেমন নানা-বিধ শোভাযুক্ত বেশভূষাদি অগ্নিদ্বারা দগ্ধ হইয়া ভস্মরাশি মাত্র হয়, তদ্রূপ ক্রোধ দ্বারা মনুষ্যের গুণ সমূহ নষ্ট হইয়া তৎপরিবর্ত্তে দোষ সমূহের অবস্থিতি

হয। ক্রোধ প্রবল হইলে আমাদিগের অনিষ্ট জন্য ইন্দ্রিযগণ সম্পূর্ণরূপে তাহার সহকারী হয, তখন কর্ণ হিতবাক্যকেও বিপরীত শ্রবণ করে, চক্ষুঃ পরমাত্মীয ব্যক্তিকেও শত্রু তুল্য দেখে, বাক্যও অযোগ্য কথা কথনে প্রবৃত্ত হয। এপ্রযুক্ত সহস্র সহস্র স্থানে দেখা যাইতেছে যে ক্রোধ হেতু আত্মহিতাহিত বিবেচনা করিতে না পারিযা, প্রিযতম পুত্র মিত্রাদিকেও বিনষ্ট করিতেছে, ক্রোধ হেতু আত্ম অতি পূজ্য মান্য পিতামাতা গুরু প্রভৃতিকেও অপমান ও বধ করিতেছে, ক্রোধ হেতু আত্মহত্যাতেও মনুষ্যদিগের উৎসাহ হইতেছে। এই প্রকার ক্রোধ রিপুতে আচ্ছন্ন হইলে বিষয-জ্ঞান, পরম জ্ঞান, ধন, জন, মান, ভৃত্য, অমাত্য প্রভৃতি হইতে সম্পূর্ণরূপে বিযুক্ত হয।

এই প্রকার কামেরও অধীন হইলে পিতামাতা, ভ্রাতা, দারা, পুত্র, মিত্রাদিকে শত্রু তুল্য জ্ঞান হয, এবং আপনার যথার্থ নন্দকারী লোকদিগকেও আত্মীয বোধ হয। যথেষ্টাচারী ব্যক্তিরা তাহার প্রিয আলাপের যোগ্য হয, শিষ্ট জনের সঙ্গে সে সহবাসেও ঘৃণা করে এবং কেহ এই কামের উদ্দেশে আপনার প্রাণ পর্য্যন্ত নষ্ট করিতে উদ্যত হয।

এই কামের প্রবলতা হেতু লোভেরও প্রবলতা হয, তখন অপব্যযের প্রযোজন হইযা ধনের নিমিত্তে কোন কুকর্ম্মকেই সে কুকর্ম্ম জ্ঞান করে না। ক্রমে চৌর্য্যঃ

বৃত্তি ও দস্যুবৃত্তিতে প্রবৃত্ত হইয়া সেই সকল কুকর্ম্ম গোপন করিবার জন্য নানা ক্লেশে কালযাপন করে, প্রকাশ হইলে রাজদণ্ডে কারাগারে রুদ্ধ বা দেশান্তরিত হইয়া যাবজ্জীবন সমূহ মনস্তাপে তাপিত হয়।

পরিপূর্ণরূপে মোহে আচ্ছন্ন হইলে সংসারকে সার ভ্রমে অনিত্য পুত্র, কলত্র, মিত্র, বিত্ত প্রভৃতিতে অত্যন্ত আসক্ত জন্য অত্যল্প হানিতেও সে অগাধ শোকার্ণবে নিমগ্ন হয়। এই মোহান্ধ ব্যক্তির অর্থ দ্বারা পরোপকার করা দূরে থাকুক, আপনার উদর ভরণীয় অন্নের নিমিত্তেও সে অর্থের ব্যয় করিতে ক্লেশ জ্ঞান করে। সুতরাং এই ব্যক্তির ইহকাল ও পরকাল একেবারে নষ্ট হয়।

এই প্রকার রিপু সকলের প্রবলতা হইলে মহানিষ্টের সম্ভাবনা। ইহাদিগকে বশীভূত করিতে পারিলে দুঃখ নিবৃত্তি ও সুখ প্রাপ্তি হয়। এই রিপুগণের প্রথম আক্রমণ কালীনই যদি ধৈর্য্যকে দৃঢ়রূপে অবলম্বন করা যায়, তবে ইহারা সহজেই বশীভূত হয়, নতুবা উপভোগ দ্বারা ইহাদিগকে শান্ত করিবার মানস করিলে, শান্ত হওয়া দূরে থাকুক, বরঞ্চ তাহারা অধিক প্রবল হয়।

কাম্য বস্তুর উপভোগ দ্বারা কামনার কখন নিবৃত্তি হয় না, প্রত্যুত ঘৃত প্রাপ্ত অগ্নির ন্যায় আরো বৃদ্ধিই হইতে থাকে।

এই রিপু সকলকে এই প্রকার বশীভূত করিবার শক্তি, পরমেশ্বর আমাদিগকে দিয়াছেন, পশুদিগকে দেন নাই। অতএব, আমরা যদি এই সকল উপায় দ্বারা রিপুগণকে দমন না করি, তবে পশুতুল্যতা প্রাপ্ত হই। কিন্তু পরমেশ্বর আমাদিগকে এমত শক্তি দেন নাই যে, কাম ক্রোধাদিকে একেবারে ধ্বংস করি, বরং এই রিপু সমুদয় একেবারে বিনষ্ট হইলে সংসার নির্ব্বাহে সমুহ ব্যাঘাত হইত।

কামের অভাব হইলে সৃষ্টির লোপাপত্তি হইত। যদিও সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর স্ত্রীপুরুষের সংযোগাধীন সৃষ্টির নিয়ম না করিয়া অন্য কোন নিয়ম করিতেন, তথাপি স্ত্রীপুত্র ইত্যাদি তাবৎ স্নেহজনক সম্বন্ধের অভাব হেতু লোক সমুদয় কেবল আপনাদিগের উদর ভরণপোষণ কোন প্রকারে করিয়া সংসারের অন্যান্য তাবৎ সুখ হইতে বঞ্চিত হইত।

ক্রোধের অভাব জন্য অমান্য করিতে কেহ ভয় করিত না, সহসা সকলেই আমাদিগের ধনাদির অপহরণ করিত, পুত্র, ভৃত্য, কলত্রাদি যথা নিয়মে থাকিত না, ইহাতে সংসারের কর্ম্ম কি প্রকারে নির্ব্বাহ হইত?

মমতার অভাব হইলে এ পৃথিবীতে আত্মীয়তাও অভাব হইত। কেহ কাহারো দুঃখে দুঃখভাগী বা কেহ কাহারো সুখে সুখভাগী হইত না। সুতরাং কেহ কাহারো উপকার করিতে প্রবৃত্ত হইত না;

আপনার স্ত্রী-পুত্রাদিকেও ভরণ পোষণ করিতে সকলে অবহেলা করিত।

অতএব ধার্ম্মিকদিগের কর্ত্তব্য যে তাঁহারা ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক কামক্রোধাদি আপনার অধীনে রাখিয়া, বিচার দ্বারা যথোপযুক্ত মত মনোবৃত্তি সমুদয়কে নিয়োগ করিয়া সংসার নির্ব্বাহ করিতে যত্নশীল হয়েন, যাহার দ্বারা সর্ব্বপ্রকার দুর্গতি হইতে পরিত্রাণের সম্ভাবনা।

সত্য ব্যবহার।

সত্যেরই জয়, মিথ্যার জয় হয় না। মনের বাসনা, মন্ত্রণা, আহ্লাদ এবং শরীরে রোগ প্রভৃতি অন্যের নিকটে প্রকাশ নিমিত্তে দয়াবান্ পরমেশ্বর আমাদিগকে বাগিন্দ্রিয় দিয়াছেন। বিবেচনা করিলে বাক্য আমাদিগের কি পর্য্যন্ত সুখের নিমিত্তে হইয়াছে। মনে কত প্রকার বাসনা হইতেছে, বাগিন্দ্রিয় যদি না থাকিত, তবে সেই সকল বাসনা কেবল হস্তপদমুখভঙ্গী দ্বারা সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ করিতে অশক্ত প্রযুক্ত অনেক বাসনা অপূর্ণ থাকিত। রোগের সময়ে শরীরের ভাব চিকিৎসকের নিকটে ব্যক্ত করিতে অক্ষম হইলে রোগের আশু প্রতীকার হইত না। যদি আত্মীয় ব্যক্তির নিকটে মনের যন্ত্রণা প্রকাশ করিতেই

না পারিতাম, তবে সেই যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইবার অন্য আর কি উপায় থাকিত?

বাক্য থাকাতে পরস্পর কথোপকথন দ্বারা পরস্পর আত্মীয়ভাব বৃদ্ধি হইতেছে। বাক্য থাকাতে জ্ঞানোপার্জ্জনের সুলভ উপায় হইয়াছে, এবং প্রয়োজনীয় কর্ম্মসকল অত্যল্প সময়ে নিষ্পন্ন হইতেছে। এই বাক্য থাকাতে বন্ধুর নিকটে মনের আহ্লাদ এবং দুঃখ প্রকাশ করিয়া আহ্লাদকে দ্বিগুণ এবং দুঃখকে অর্দ্ধ করিতে পারিতেছি। বাক্য মহোপকারের নিমিত্তে হইয়াছে, কারণ এই বাক্য মনের সমুদয় ভাব স্পষ্ট রূপে ব্যক্ত করিতে পারে। ইহার বিপরীত যে ব্যক্তি আপনার মনের ভাব অন্যথারূপে ব্যক্ত করে, তাহার সম্বন্ধে এই বাক্য মহৎ অপকারের নিমিত্তে হয়, কারণ তাহাকে মিথ্যাবাদী জানিয়া কেহ তাঁহার কথাতে বিশ্বাস করে না, এবং সেই কুকর্ম্মান্বিত ব্যক্তিকে সকলেই ঘৃণা করে।

সেই ব্যক্তি সত্যবাদী, যিনি আপনার মনের ভাব সেই প্রকারে ব্যক্ত করেন, যে প্রকারে তিনি জানেন যে শ্রোতা গ্রহণ করিবে। নতুবা আপনার মনের ভাবের বিপরীত অর্থ শ্রোতা গ্রহণ করিবে, এমত বিবেচনা করিয়া দুই ভাবার্থ ঘটিত বাক্য প্রয়োগ করিলে, তাহাকে মিথ্যাবাদী মধ্যে গণ্য করিতে হয়। কোন এক রাজা তাঁহার শত্রুদিগকে পরাজয় করিলে, তাহারা

এক দুর্গরুদ্ধ করিয়া তাহার মধ্যে স্থিতি করিল।
ইহাতে ঐ রাজা, তাহাদিগকে দূতদ্বারা জানাইলেন,
যে যদি তোমরা অস্ত্রহীন হইয়া দুর্গকে পরিত্যাগ কর,
তবে তোমাদিগের শরীরের এক বিন্দুও রক্তপাত
করিব না। এই কথায় জীবনের আশ্বাস পাইয়া ঐ
শত্রুদল সকল অস্ত্রহীন হইয়া দুর্গ পরিত্যাগ করিলে
তাহাদিগকে রাজা ছেদন না করিয়া ভূমিতে প্রো-
থিত করিলেন, ইহাতে কি ঐ রাজাকে সত্যবাদী
বলা যায়? কেহ কোন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইত না, যদি
সেই কুকর্ম্ম দ্বারা কোন দুঃখ নিবৃত্তি বা সুখ প্রাপ্তির
ভ্রান্তি না জন্মিত। কাহারো পর-ধনাপহরণে বা পর-
দারাভিগমনে প্রবৃত্তি হইত না, যদি তাহা দ্বারা
কোন দুঃখ নিবৃত্তি বা সুখ প্রাপ্তির বিশ্বাস না
থাকিত। সেই প্রকার কাহারো মিথ্যা কহিতে প্রবৃত্তি
হইত না, যদি মিথ্যা কথা দ্বারা কোন দুঃখ নাশ বা
সুখের আশা না হইত। ইহা সর্ব্বদা মনে রাখা
কর্ত্তব্য যে কুকর্ম্ম দ্বারা দুঃখ নিবৃত্তি ও সুখ প্রাপ্তির
যে আশা, সে কেবল আশা মাত্র, তাহা কখন পূর্ণ
হয় না। কিন্তু কুকর্ম্ম-জনিত ফল যে যন্ত্রণা, তাহা শীঘ্র
বা বিলম্বে নিশ্চয় ভোগ করিতে হয়। পর-ধনাপহারী
নিজ কুকর্ম্ম প্রকাশ-ভয়ে সর্ব্বদা সশঙ্কিত, এবং পর-
দারাভিগামী নিজ পরিবার নিকটে ভর্ৎসিত, কুলটারা
স্বামীকৃত তাড়িত, বন্ধুদ্বারা লাঞ্ছিত, রাজ-দ্বারে

দণ্ডিত হইলে কি প্রকারে সুখী হইতে পারে? সেই প্রকার অদূরদর্শী মিথ্যাবাদী তাবৎ লোকের অবিশ্বস্ত এবং ঘৃণিত হইয়া সমূহ দুঃখে পতিত হয়। অতএব সাবধান থাকা উচিত, যেন কিঞ্চিৎ কালের সুখাশ্বাসে অতি দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত ক্লেশ পাইতে না হয়। সকল কুকর্ম্ম হইতে মিথ্যা কথন কুকর্ম্ম পরিত্যাগ করা সুকঠিন। যে ব্যক্তি একবার পরধনাপহরণ বা পরস্ত্রী গমন করিয়াছে, সে ব্যক্তি সেই সকল কুকর্ম্ম গোপন রাখিবার জন্য পুনর্ব্বার তাহাতে প্রবৃত্ত হইতে বাধ্য হয় না, বরং তাহা হইতে নিবৃত্তি থাকিতেই যত্ন করে। কিন্তু যে ব্যক্তি যে বিষয়ে একবার মিথ্যা কহিয়াছে, সে ব্যক্তি সেই বিষয়ের প্রসঙ্গ উপস্থিত হইলে, পূর্ব্বকৃত মিথ্যা কথন কুকর্ম্ম গোপন রাখিবার জন্য পুনশ্চ মিথ্যা কহিতে বাধ্য হয়। একবার এক বিষয়ে মিথ্যা কথা কহিয়া দ্বিতীয় বার আর সে বিষয়ে তাহার সত্য কথা কহিতে প্রবৃত্তি হয় না, কারণ সে বার সত্য কহিলেও মিথ্যাবাদীর মধ্যে গণ্য হয়। কিন্তু তাহার কর্ত্তব্য যে পূর্ব্ব দোষ স্বীকার করিয়া দ্বিতীয় বার সেই দোষ করিতে ক্ষান্ত থাকে।

আত্মার সত্ত্বা।

অদ্য আত্মার পৃথক্‌ সত্ত্বাবিষয়ে অস্মদাদির যে অভিপ্রায়, তাহা ব্যক্ত করিতে অভিলাষ করি, এতদ্বিষয়ে

আমাদিগের কিমত সভ্যগণের মধ্যে বোধ করি, অনেকেই তাহা অবগত আছেন। এই বিষয়টি লইয়া অনেক দিবস বিচার হইয়াছে ; এবং বিচারের দ্বারা যে পর্য্যন্ত সুস্থির করিতে সক্ষম হইয়াছি, তাহা তত্তৎ-কালে প্রকাশ করিতে ত্রুটি করি নাই। অতএব নিম্ন লিখিত প্রবন্ধে কোন নূতন যুক্তি বা হেতু নির্দ্দেশিত হইবেক এমত ভরসা করা যাইতে পারে না। কিন্তু ইহাতে অভিনব ভাব প্রকাশ করিবার সাধ্য নাই বলিয়া এতদ্বিষয়ের বারম্বার আলোচনা দ্বারা যে কোন ফল দর্শিবেক না, এমত বিবেচনা করিতে পারি না। নিরবচ্ছিন্ন যুক্তি অবলম্বন করিয়া আত্মার সত্ত্বা প্রতিপন্ন করা অতি সহজ ব্যাপার নহে। অপিচ একবার তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারিলে উহার উপযোগিতা হ্রাস হয় এমতও নহে। আত্মার অস্তিত্ব বিরুদ্ধে যে সকল কুতর্ক প্রদর্শিত হয় তাহাদের পক্ষে সুগম এই যে, তাহারা অনায়াসে সকলের বোধগম্য। কিন্তু উহার পোষকতায় যে সকল প্রধান প্রধান হেতু ও প্রমাণ প্রয়োগ করা যায়, তাহারা পরিশুদ্ধ হইলেও অনেকের পক্ষে তাহাদিগের হৃদয়ঙ্গম করা ও তাহাদের বলবত্তানুভব করা সুকঠিন হইয়া উঠে। এমত কি, যাঁহারা এতদ্বিষয়ের আদ্যোপান্ত বিশেষ অবগত আছেন, এবং ইহার স্বপক্ষ ও প্রতিপক্ষের হেতু সকল তন্নতন্ন করিয়া দেখিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষেও

কখন কখন এরূপ ঘটিযা থাকে, যে সকল সময়ে অনু-
কূলক হেতু সকল অন্তঃকরণে জাগরূক না থাকা স্বত্বে
প্রতিপক্ষের আপত্তি বলবৎ অনুভূত হইয়া বিশ্বাসের
স্থৈর্য্য বিচলিত বা বিলোড়িত করে। কিন্তু এতদ্রূপ
হওয়া কখনই উচিত নহে। অস্মদাদির ধর্ম্মের মূল-
সূত্র সমূহের প্রতি এমত প্রগাঢ় ও অবিচলিত বিশ্বাস
থাকা আবশ্যক, যে বিধর্ম্মী নাস্তিকের বাক্‌বিতণ্ডা বা
উপহাসাদি দ্বারা তাহা লুণ্ঠিত বা বিড়ম্বিত না হয়।
আত্মার সত্বাতে বিশ্বাস সুতরাং পরকাল ও পারত্রিক
পাপ পুণ্যের ভোগাভোগ বিষয়ে আস্থা ধর্ম্মরূপ ন-
হোচ্চ মঞ্চের ভিত্তি স্বরূপ। ইহা অস্থির ও কম্পিত
হইলে, উপবিষ্ট মঞ্চের অধঃপতনের সম্পূর্ণ আশঙ্কা।
এই কারণেই আমাদের মধ্যে সকলের এবিষয়টি এমত
উত্তম রূপ অবগত থাকা বিধেয় যে ইহাতে কোন ভ্রান্তি
হইবার সম্ভাবনা না থাকে। ইহা সকলেই অবগত
আছেন যে আক্রমণকারী শত্রু অপেক্ষা অবরোধকের
অধিক সজ্জীভূত থাকিতে হয়। বিপক্ষ কোন কালে
আসিয়া কিরূপে আক্রমণ করিবে, তাহার নির্দ্দিষ্ট
নাই। তাহার এ বিষয়ে দিবানিশি চিন্তা করিতে হয়
না, সুসজ্জিত থাকিতেও হয় না। অথচ সে ইচ্ছা ক্রমে
যুদ্ধ-প্রণালী পরিবর্ত্তন করিতে পারে। কিন্তু প্রতি-
রোধকের সর্ব্বদাই যে পর্য্যন্ত হইতে পারে, প্রস্তুত থা-
কিতে হয়। পূর্ব্বপক্ষ ও সিদ্ধান্তকারকের মধ্যেও

এরূপ বিভিন্নতা। একে যে প্রকার আপত্তি কেন উপস্থিত করুক না, অন্তের তদ্বিষয়ে চিন্তা করিতে হইবে, এবং উত্তর প্রদানেও প্রযত্ন করিতে হইবে। এই হেতুতেই ধর্ম্মের মূলসূত্র সকল সংরক্ষণ বিষয়ে অস্মদাদির আপাদ মস্তক সুসজ্জীভূত থাকিতে হয়। কেবল সুসজ্জীভূত কেন, সৈন্য যেমন যুদ্ধকাল ব্যতীতও অস্ত্রচালনাদি ক্রিয়ায় বিরতি করে না, সেই রূপ আমাদের ধর্ম্মরক্ষোপযোগি অস্ত্র চালনার অভ্যাস করা সততই উচিত, যে বিপক্ষ উপস্থিত হইলে তৎশিক্ষাতে কালাতীত না হয়। আত্মার পৃথক সত্ত্বার বিরুদ্ধে অধুনা যে রূপ আপত্তি উদ্ভাবিত হইয়া থাকে, তাহা এই। আত্মাকে স্বতন্ত্র পদার্থ স্বীকার না করিয়া পদার্থের সংযোগের একটি বিশেষ গুণ বলিলে ক্ষতি কি? ঘটিকাদি যন্ত্রে যেরূপ তদন্তর্গত সুকৌশলের প্রভাবে আপন হইতে চলিতে দেখা যায়, বিশ্বপাতার অলৌকিক সুকৌশলসম্পন্ন ভৌতিক দেহে গতি-ক্রিয়াদির সঞ্চারও কেন সেইরূপ বিবেচনা করা যাউক না। আর সংযোগের যে অসাধারণ গুণ সম্ভবে, তাহা উদাহরণ দ্বারাও প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে। যথা, চূর্ণ ও হরিদ্রা সংযোগে পাটল বর্ণের উৎপত্তি, এইরূপ আপত্তি দর্শাইয়া অনেকে আত্মার পৃথক্ সত্ত্বা বিষয়ে অস্মদাদির বিশ্বাস খণ্ডন করিতে প্রযত্ন পাইয়া থাকেন, অতএব এ আপত্তি কি পর্য্যন্ত সুসঙ্গত ইহা

বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত। এ বিষয়ে উত্তর প্রদানে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে এতন্মাত্র কর্ত্তব্য যে এই কুতর্ক অধুনা উদ্ভাবিত হইয়াছে এমত নহে। পূর্ব্বকালের নাস্তিকেরাও ইহাকে অবলম্বন করিয়া ধর্ম্মের মূলসূত্র উন্মূলন করিতে অভিলাষ করিয়াছিলেন। তবে এতদ্বিষয়ে তাহাদের চেষ্টা যে ব্যর্থ হইয়াছে, তদ্দ্বারা ইহাই উপলব্ধি হয় যে হয়ত এ বিষয়টি স্বতঃসিদ্ধ ও প্রকৃতিমূলক। আমাদের প্রকৃতিতে ইহা এমত স্পষ্টাক্ষরে মুদ্রাঙ্কিত রহিয়াছে যে, এতদ্বিরুদ্ধে যে কেন যত অলীকাপত্তি উপস্থিত করুন না, ইহাতে বিশ্বাস না করিয়া কাহারও অব্যাহতি নাই। অথচ হয়ত ইহাই হইবে যে এ বিশ্বাসের অনুকূলক এমত প্রবল হেতু সকল নির্দ্দেশিত আছে যে তাহাদের প্রামাণ্য অস্বীকার করা ক্ষণকালের নিমিত্তেও সম্ভব নহে। ইহা স্বতঃসিদ্ধ কি না? পশ্চাৎ বিবেচনা করা যাইবেক। অপিচ ঈশ্বরের সত্ত্বা বিষয়ে কতিপয় দিবস পূর্ব্বে আমরা যে প্রবন্ধটি পাঠ করিয়াছি, তাহাতেই ইহার মর্ম্ম সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এ বিষয়ে অনুকূলক যে সকল যুক্তি প্রদর্শন করা যাইতে পারে, এ স্থলে আমরা কেবল তাহারই উল্লেখ করিব। বিগ্রহাদিতে এমত রীতি প্রচলিত আছে যে স্বীয় অস্ত্র প্রহার দ্বারা শত্রুকে পরাভব করার পূর্ব্বে বিপক্ষকে নিরস্ত্র করিতে চেষ্টা পাওয়াও দোষাবহ নহে। এত-

ন্যাযের অবলম্বন করিবা যদি উল্লিখিত আপত্তির অবাস্তবিকতা ও অলীকতা প্রতিপন্ন করিতে পারি, তাহা হইলে আমার অভিলাষ আংশিক মতে সুসিদ্ধ হয। তৎপর এতদ্বিষযে যে সকল প্রচুর হেতু নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহা দর্শাইতে পারি. বিশেষ না দর্শাইলেও কোন ক্ষতি বোধ হয না। অতএব এতদ্বিষযে যে অস্মদাদির চেষ্টা, বোধ করি আপনাদের মধ্যে কেহ ইহাকে ব্যর্থ যত্ন বিবেচনা করিবেন না। আত্মা স্বতন্ত্র পদার্থ নহে, পদার্থ সংযোগের একটি বিশেষ গুণ মাত্র। অগ্রে এই কথাটি সকলে বিবেচনা করিয়া দেখুন যে ইহাতে কোন দোষ স্পর্শিতে পারে কি না? আপাততঃ বিবেচনায ইহাতে কোন অযৌক্তিক ভাবের আভাস আছে, বোধ করি এতদ্বিষযে কাহারো সন্দেহ হইবেক না।

পৃথিবীতে পদার্থের অভাব নাই, গুণেরও অভাব নাই। অতএব যে বিষযে আমরা চাক্ষুষ করিতে পারি না, এবং ইন্দ্রিযের অগ্রাহ্যতা হেতুতে যে বিষযের অন্যের বাক্যের উপর বিশ্বাস করিতে হয, তাহা যে পদার্থ বিশেষের [illegible] এমত অনুভব করা অসম্ভব কি? মনুষ্যবর্গের [illegible] উপর যে সকল প্রতারণা হইযা আসিতেছে [illegible] প্রিসূচক শব্দের দ্বারা অভিব্যক্ত ভাব [illegible] ভযানক। তাহাদিগের খণ্ডন কর [illegible] পারে না। এই

কথার সত্যতার প্রমাণ স্বরূপ উর্দ্ধ প্রদর্শিত সিদ্ধান্ত-কেই লক্ষ্য করা যাইতে পারে। বিপক্ষবাদীরা যদি ইহাকে ব্যাপ্তিসূচক শব্দে বিন্যস্ত না করিয়া কোন নির্দ্দিষ্ট পদার্থের নির্দ্দিষ্ট গুণরূপ ব্যাখ্যা করিতেন, তাহা হইলে তাঁহাদের ভ্রম প্রদর্শন করা অতি আয়াস সাধ্য হইত না। কারণ তাহা হইলে তাঁহাদের ভ্রান্তি জাজ্জ্বল্যমান দেখাইয়া দেওয়া যাইত। কিন্তু আত্মাকে পদার্থ বিশেষের সংযোগ বিশেষের বিশেষ গুণ বলাতে আমরা শতাধিক উদাহরণ উদ্ধৃত করিয়া ঐ সকল স্থলে সংযোগের দ্বারা আত্মার সৃষ্টি হয় না, ইহা দেখাই, তাহা হইলেও তাঁহাদের সাধারণ সিদ্ধান্তের অবাস্তবিকতা সপ্রমাণ হয় না। তাঁহারা তখনও পূর্ব্বমত অভিব্যাপ্ত শব্দরূপ মেঘের অন্তরালে থাকিয়া স্বমত রক্ষা করিতে পারিবেন। সে যাহা হউক গুণের বিষয় অস্মদাদির কিরূপ পরিজ্ঞান আছে এবং পদার্থেরই বা কি গুণ সম্বন্ধে, প্রথমে ইহার বিবেচনা করা যাউক। ভূতের গুণ বিষয়ে অস্মদাদির অন্তঃকরণে যে রূপ ভাব নিবেশিত হইয়া রহিয়াছে, তাহার বিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে প্রতীত হইবে যে তাহারা পদার্থের সত্ত্বার সাক্ষীর স্বরূপ। ইহারাই ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ হইয়া পদার্থের সত্ত্বা বিষয়ে বিশ্বাস জন্মাইয়া দেয়, নতুবা আমরা পদার্থ কি ভূতকে ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ করিতে পারি না। পদার্থের যদি গুণ না থাকিত,

তাহা হইলে তাহার সত্ত্বা প্রমাণ করাও দুঃসাধ্য হইত। অস্মদাদির দেশীয় নৈয়ায়িক পণ্ডিতগণ গন্ধ রস স্পর্শ প্রভৃতিকেও পদার্থের গুণ মধ্যে নিবেশিত করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু অতি সহজ বিবেচনা দ্বারাই অনুভূত হইবেক যে তাহারা পদার্থের গুণ হওয়া দূরে থাকুক, তাহাদের দ্বারাই আত্মার পৃথক্ সত্ত্বা উপলব্ধি হয়। কারণ এ সকল গুণের পরিজ্ঞান জ্ঞাতার অভাবে হইতে পারে না। সে যাহা হউক, বস্তুর গুণ বিষয়ে আমাদের যে পরিজ্ঞান, তদ্দ্বারা অনায়াসেই বুঝা যাইতে পারে, যে নিম্ন লিখিত দুইটি ভাব তাহাদের সকলের উপরই বর্ত্তিবে। প্রথম, বস্তুর নানাবিধ গুণ থাকিলেও গুণের গুণ উপলব্ধি হয় না। দ্বিতীয়, বস্তুর এক গুণে কিছু গুণান্তরের অনুভব কি বিচার করিতে পারে না। তেজঃ অতি সূক্ষ্ম বস্তু, ইহা পদার্থ কি পদার্থের গুণ, এতদ্বিষয়ে পণ্ডিত মণ্ডলী মধ্যে এক কালে ঘোরতর বিতণ্ডা উপস্থিত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু গুণের আবার গুণ হইতে পারে না, আর তেজোরূপ পদার্থের নানাবিধ গুণ লক্ষিত হইতেছে বিধায় অধুনা বিচক্ষণগণ ইহাকে পৃথক্ পদার্থ সংজ্ঞায় স্বীকার করিয়াছেন। আত্মাও যদি সেইরূপ পদার্থের অথবা পদার্থের সংযোগ বিশেষের গুণ হইত, তাহা হইলে আবার ইহার গুণ থাকা কিরূপে সম্ভবে। এইমত অবস্থাতে অনুমিতি, উপমিতি, চিন্তা, দয়া, ভক্তি

প্রভৃতি যাহাদিগকে আমরা মনোবৃত্তি অথবা মনের গুণ মধ্যে অঙ্গীকার করি, তাহাদিগকে কি বলা যাইতে পারে? অপর যদি ইহাও স্বীকার করা যায় যে আত্মা কি মন কোন পদার্থের গুণ নহে। আর এতৎ প্রতিপাদক শব্দও গগণ-কুমুদিনী বা বন্ধ্যার পুত্রবৎ অলীক শব্দ মাত্র, ফলতঃ তাহার অনুবোধক ভাব নাই।—

আর উপমিতি, অনুমতি, চিন্তা, দয়া, হর্ষ, বিমর্ষ প্রভৃতি গুণ যাহা আমরা আত্মাতে আরোপ করিয়া থাকি, বস্তুতঃ তাহারা কোন পদার্থ অথবা পদার্থের সংযোগ বিশেষের গুণ। অধঃ প্রদর্শিত হেতু গ্রাহ্য করিলে এইরূপ ব্যাখ্যাও সুসঙ্গত হইতে পারে না। এ সকল যে নিরবচ্ছিন্ন পদার্থের গুণ, বোধ করি ইহা কেহই স্বীকার করিতে সাহস পাইবেন না। কারণ ইহারা যদি পদার্থের সাধারণ গুণ হইত, তাহা হইলে উহাদিগকে পদার্থের সকল অবস্থাতেই প্রাপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু তাহা না হইয়া যখন কেবল জীব-শরীর রূপ ভূতের বিশেষ অবস্থাতে ইহারা লক্ষিত হয়, তখন বিপক্ষবাদীরা তাহাদিগকে সংযোগ বিশেষের কিম্বা পদার্থের গুণই বলুন, ইহা অস্বীকার করিতে পারিবেন না, যে পদার্থের এক গুণে অন্যকে অনুভব করিতে পারে না, প্রত্যক্ষ করিতে পারে না, এবং গুণাগুণ বিচার করিতেও পারে না। আকর্ষণ-শক্তি কিছু ভেদকর্ত্তা অনুভব করিবার সাধ্য রাখে না, পরিমাণ কিছু জড়-

ত্বের প্রত্যক্ষ করে না, এবং সচ্ছিদ্রতা কিছু কাঠিন্যের বিচার্য্য নহে। এখন বিবেচনা করিয়া দেখুন যে অনুমিতি, উপমিতি প্রভৃতি মানসিক গুন যাহা প্রতিপক্ষের মত অবলম্বন করিলে পদার্থ সংযোগ বিশেষের গুণমধ্যে স্বীকার করিতে হয়, তাহাদের প্রতি এই কথাটি কি প্রকারে খাটে। অনেকেই অবগত আছেন, অথবা কিঞ্চিৎ বিবেচনা করিলেই অবগত হইতে পারেন, যে রস, গন্ধ, স্পর্শ প্রভৃতি গুণের অনুভবের নিমিত্ত অনুভাবক কোন্ পদার্থের আবশ্যক করে? যে পর্য্যন্ত এই অনুভাবটি না হয়, সে পর্য্যন্ত পদার্থের সত্ত্বাতে বিশ্বাস জন্মে না। সুতরাং আমাদের সম্বন্ধে তাঁহা না থাকিলেও যে ফল ঘটিত, তাহাই অনুভব করা যাইতে পারে। এই অনুভাবক পদার্থকেই মন কি আত্মা বলিয়া থাকি, ইহাতে ভূতের গুণ স্বীকার করিলে ভূতের একগুণে অন্য গুণকে অনুভব করিতে পারে, একথাটি স্বীকার করা হয়। অতএব ইহার দ্বারাই মন এবং পদার্থের সংযোগের গুণের মধ্যে যে প্রভেদ আছে, তাহা অনায়াসে দেখা যাইতেছে। বস্তুর সংযোগের এমত কোন গুন নাই যে একে অন্যের বিষয় বিচার করিতে পারে। যে গুণটি বিপক্ষের মত গ্রহণ করিলে মনঃ শব্দের বাচ্য, তাহাতে এই শক্তিটি বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইতেছে। এমনকি, এতদ্ব্যতীত অনুভব পদার্থ পৃথিবীতে আর কিছুই দেখা যায় না।

সুতরাং মনঃ যে পদার্থের সংযোগের গুণ হইতে স্বতন্ত্র বস্তু, ইহা সপ্রমাণ করিবার জন্য অধিক বাক্যব্যয় করিবার আবশ্যক দেখা যায় না।

মনের কথা পশ্চাৎ বুঝা যাইবেক, ঘটিকা যন্ত্রে যে গতি দৃষ্ট করতঃ অনদৃশ উপমার সাহায্যে কেহ কেহ আত্মাকে বস্তুর সংযোগের গুণ বলিয়া থাকেন, বাস্তবিক সেই গতিই যে পদার্থের গুণ নহে, ইহা সপ্রমাণ করিতে পারিলে বোধ করি, আমাদের অভিলষিত সিদ্ধান্ত সংস্থাপনের পক্ষে আর কোন বাধা থাকে না। পদার্থবিৎ পণ্ডিতেরা পদার্থের অনেকানেক গুণ প্রকাশ করিয়াছেন বটে, কিন্তু গতি যে ইহার এক স্বাভাবিক শক্তি, তাহাদের মধ্যে কেহই একথা স্বীকার করেন না। স্বীকার করা দূরে থাকুক, পদার্থের জড়ত্ব অর্থাৎ আপনা হইতে অবস্থা পরিবর্ত্তনের ক্ষমতা ভাব রূপ সাধারণ গুণ যখন অঙ্গীকার করিয়া গিয়াছেন, তখন গতিবিধি কখনই স্বীকার্য্য নহে। সাধারণে বিশ্বাস করিয়া থাকে যে ঘটিকাদি যন্ত্র আপনা হইতেই চালিত হয়, কিন্তু কিঞ্চিৎ বিবেচনা করিলেই, এই ভ্রম দূরীকৃত হইতে পারে। ঘটিকা যন্ত্রের যে গতির সঞ্চার, তাহা তদন্তর্গত কোন কৌশলের কার্য্য নহে। কিন্তু ঐ সকল কৌশলে এমত গুণ আছে যে, তাহাতে গতির আবির্ভাব হইলে, তাহা অপক্ষয় হওয়া পর্য্যন্ত নির্দ্ধারিত নিয়মে পরিচালিত হয়। নতুবা প্রথমতঃ গতির সৃষ্টি

করিতে পারে না। ফলতঃ ঘটিকা-যন্ত্র যখন কিছু কাল চলিয়া আপনা হইতেই স্থির হয়, এবং ভিন্ন কোন কারণে পুনরায় গতির সঞ্চার ব্যতীত স্বয়ং পরিচালিত হইতে পারে না, তখন যে ইহার স্বতঃসিদ্ধ গমনের শক্তি নাই, এটি অনায়াসেই অনুভব করা যাইতে পারে। ইহা দ্বারা গতিশক্তি যে পদার্থের সাধারণ গুণ নহে, তাহা অবধারিত হইল। এখন বিবেচনা করিয়া দেখুন, যে শরীর যন্ত্রের গতির সহিত ঘটিকার চালনার কোন সাদৃশ্য আছে কি না? দেহের গতি আপনা হইতেই উদ্ভাবিত হয়, এবং আপনা হইতেই ক্ষান্ত হয়, বিরতির পর আবার ইচ্ছানুসারে পুনরুদ্ভাবিত হইয়া থাকে। এই সকল কারণে শরীরের গতিশক্তি ঘটিকা যন্ত্রের পরিচালনা হইতে যে কত পৃথক্ ও বিভিন্ন, ইহা সহজেই বোধ হইবেক। এমতাবস্থাতে গতিশক্তিকে পদার্থের গুণমধ্যে গণ্য করিলেও ইহার সহিত শরীর চালনা, এমত অসদৃশ যে তদ্দ্বারা শেষোক্ত বিষয়টিকে পদার্থের গুণ মধ্যে পরিগণিত করিবার জন্য কোন হেতু প্রদর্শিত হয় না।

যদি এমত আপত্তি করা যায় যে পদার্থের সংযোগ বিশেষে গুণের উৎপত্তি হয়, যেমন চূর্ণ ও হরিদ্রা মিশ্রিত করিলে পাটল বর্ণের সৃষ্টি হয়। এইরূপ বিবেচনাতে যে একটি বিষম ভ্রম আছে, বোধ করি অনেকে তাহা অবগত নহেন। রসায়ন শাস্ত্রের অধ্যাপকগণ ইহা

ভালরূপ নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন, যে সংযুজ্য বস্তুতে যে গুণ প্রকাশিত কি অপ্রকাশিত রূপে বর্ত্তমান নাই, সংযোগ দ্বারা তাহার উৎপত্তির সম্ভাবনা হইতে পারে না। ইহা উল্লিখিত উদাহরণ পর্য্যালোচনা করিলেই সপ্রমাণ হইতে পারে। বর্ণ যে বস্তুর গুণ নহে, এ বিষয় বিচারে প্রবৃত্ত না হইয়া যদি তাহা পদার্থের গুণমধ্যে স্বীকার করা যায়, তাহা হইলেও প্রদর্শিত উদাহরণে কোন অসাধারণ গুণের উৎপত্তি উপলব্ধি হইতেছে না। কারণ সংযোজ্য বস্তুতে পাটল বর্ণ না থাকিলেও শ্বেত ও পীত বর্ণদ্বয় প্রকাশমান ছিল, অতএব বর্ণদ্বয়ের সংযোগে বর্ণান্তরের উৎপত্তি অনেকে যদিচ অসাধারণ বোধ করেন, প্রকৃত পক্ষে তাহা কিছু আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। কারণ স্বজাতীয় পদার্থ দ্বয়ের সংযোগ দ্বারা স্বজাতীয় পদার্থের উৎপত্তির ন্যায়-সম্মত ও বিজ্ঞানানুযায়ী। প্রদর্শিত উদাহরণ দ্বারাও কেবল তাহাই প্রতিপন্ন হইতেছে। কিন্তু স্বজাতীয় পদার্থের সংযোগ বিষম পদার্থের উৎপত্তির যুক্তি কি? পদার্থ পর্য্যালোচনা কি উল্লিখিত উদাহরণ, ইহার এক দ্বারাও প্রতিপন্ন হয় না। যদি দুই বর্ণ মিশ্রিত করিলে শব্দের উৎপত্তি হইত, কি দুই শব্দ সংযোগে বর্ণের সৃষ্টি হইত, অথবা এতদ্রূপ অন্য কোন উদাহরণ প্রদর্শিত হইত, তাহা হইলে বরং অচেতন পদার্থ দ্বয়ের সংযোগ মনোরূপ

সচেতন পদার্থের সৃষ্টির অনুভব করার পক্ষে একটি যুক্তি লক্ষ করা যাইত। আত্মাকে যদি শরীরী পরমাণু-পুঞ্জের সংযোগ বিশেষের গুণ বলা যায়, তাহা হইলে আর একটি বিষম ভ্রমে পতিত হইতে হয়। আমরা সকলেই অবগত আছি যে শরীরস্থ পরমাণু সকল ক্রমেই পরিবর্ত্তিত হইতেছে। কৈশোরাবস্থাতে শরীরে যে সকল পরমাণু ছিল যৌবনাবস্থাতে তাহা থাকে না, যৌবনাবস্থায় যাহা ছিল, বৃদ্ধাবস্থায় তাহারা থাকে না। ইহা অবধারিত হইয়াছে, যে সপ্ত বর্ষ পূর্ব্বে অস্মদাদির শরীরে যে সকল পরমাণু ছিল, এক্ষণে তাহার একটিও নাই। অতএব আত্মা যদি শরীরস্থ পরমাণু সকলের সংযোগের বিশেষ গুণ হইত, তাহা হইলে দেহের এইরূপ পরিবর্ত্ত স্বত্ত্বেও আত্মজ্ঞানের অর্থাৎ "আমিই পূর্ব্বে যাহা ছিলাম এক্ষণেও তাহাই আছি" এইরূপ বিশ্বাসের হানি হয় না, ইহারই বা কারণ কি? এই বিষয়টি সম্বন্ধে আরো ইহাও বলা যাইতে পারে, যে শরীর সুস্থাবস্থাতে দেহস্থ পরমাণু সকল যে ভাবে থাকে রুগ্ন শরীরে তাহার অবশ্য ব্যতিক্রম হয়। তথাপি এই বিশ্বাসটি কখন বিচলিত হয় না, যে আত্মা সুস্থ শরীরে থাকিয়া পূর্ব্বে সুখসচ্ছন্দ ভোগ করিয়াছে, এক্ষণে ব্যাধি যাতনাও তাহারই সহ্য করিতে হইয়াছে। অপর অনেকের শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির অভাবও দৃষ্ট হইতেছে, যুদ্ধে অথবা রোগের প্রতিকার জন্য

কাহারো বা হস্ত, কাহারো বা পদ, কাহারো বা নাসিকা, কর্ণচ্ছিন্ন হইতেছে। কিন্তু ইহার দ্বারা শরীরের অবস্থার পরিবর্ত্তন হইলেও আত্মজ্ঞানের কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন দেখা যায় না।

ইহা ভাবিয়া অনেকে শরীরের অন্যান্য পরমাণু সংযোগের গুণ না বলিয়া মস্তকস্থ মস্তিষ্ক রাশির গুণ কল্পনা করিয়া থাকেন। কিন্তু ইহা দ্বারা প্রকৃত পক্ষে কোন সুবিধা দেখা যায় না। পূর্ব্বে যে সকল আপত্তি দর্শান গিয়াছে, তদ্দ্বারা যেরূপ অন্যান্য বিষয়ে, তদ্রূপ পদার্থের সংযোগের পক্ষেও বর্ত্তিবে। অপর যেরূপ শরীরের অন্যান্য অংশের ব্যাধির সম্ভাবনা আছে, সেই রূপ মস্তিষ্ক রাশিরও হইয়া থাকে তথাপি সে অবস্থাতেও আত্মজ্ঞানের ন্যূনাধিক বোধ হয় না। ইহা চিকিৎসাবিৎ পণ্ডিতেরা প্রত্যক্ষ-প্রমাণ দ্বারা সপ্রমাণ করিয়াছেন।

উক্তে যাহা প্রদর্শিত হইল, তদ্দ্বারাই প্রতীতি জন্মিবে, যে আত্মাকে বস্তুর সংযোগ বিশেষের বিশেষ গুণ স্বীকার করা যুক্তিসম্মত নহে। আর যে সকল উদাহরণের পোষকতায় ইহা প্রতিপন্ন করার প্রযত্ন পাওয়া যায়, তাহারা বিপক্ষবাদীগণের অনুকূল না হইয়া ভামরা যে সিদ্ধান্ত করি, ববং তাহারই সাহায্য করে। যাহা ব্যক্ত করিয়াছি, তাহা যদি সত্য হয়, তবে আত্মার সত্তা বিষয়ে অন্যবিধ প্রমাণ না দর্শাইলেও

ক্ষতি হইতে পারে না। কারণ ইহার বিপক্ষে যে বিতণ্ডা উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা অলীক প্রতিপন্ন হইল; সুতরাং আমাদের সিদ্ধান্ত বিশুদ্ধ বলিয়া মানিতে হইবে, কিন্তু এবিষয়ে ক্ষান্ত থাকিবার বিষয় নাই। কারণ ইহার পোষকতায় বলবৎ হেতু সকল নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। আমরা পদার্থের সত্ত্বাতে বিশ্বাস করিয়া থাকি, কিন্তু ইহা প্রদর্শন করা যায়, যে পদার্থের অস্তিত্ব বিষয়ে বিশ্বাস করিবার জন্য যেরূপ প্রমাণ দেখা যায়, মনের সত্ত্বা পক্ষে তদপেক্ষা অধিক অপরিবর্ত্তনীয় হেতু সকল প্রতীয়মান রহিয়াছে। এবিষয়ে আমরা পশ্চাৎ বিবেচনা করিতেছি, সংপ্রতি দুই একটি সহজ উদাহরণ দেখাইব যে তদ্দ্বারা অন্তঃকরণের দ্বিধা দূরীভূত হয়। যাঁহারা আত্মার সত্ত্বা বিশ্বাস করেন, আর যাঁহারা বিশ্বাস করেন না, তাঁহাদের হেতু সকল পর্য্যালোচনা করিলে অবধারিত হইবে, যে একে, পদার্থ কি পদার্থের সংযোগের গুণ ব্যতীত অন্য বস্তুর সত্ত্বা গ্রাহ্য করেন না। অন্যে, তদতিরিক্ত মনের অস্তিত্বও স্বীকার করিয়া থাকেন। পূর্ব্বে আমরা দর্শাইয়াছি যে পদার্থ কি? ইহার গুণ ব্যতীত পৃথিবীতে অন্যবিধ বস্তুর সত্ত্বা প্রতিপন্ন করা অতি কঠিন কর্ম্ম নহে। আর গতিশক্তি পদার্থের গুণমধ্যে গণ্য করা যাইতে পারে না। সুতরাং ইহাই এতদুভয় হইতে পৃথক্ ও স্বতন্ত্র বস্তু। এক্ষণে ইহাও দেখান যাইবে যে, যে অজ্ঞাত ও অননুভূত

পদার্থ জীবন শব্দের বাচ্য, তাহাও পদার্থ কি পদার্থের গুণ হইতে বিভিন্ন। এই কথাটি হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য দুই একটি উদাহরণ প্রদর্শন করা আবশ্যক হইয়াছে। পৃথিবী-মধ্যে যে সকল পদার্থ অবলোকন করা যাইতেছে, তাহাদিগের পর্য্যালোচনা দ্বারা অবগতি হইবে যে, তাহাদের মধ্যে এক জাতীয় বস্তুর স্বভাব এই যে, স্বজাতীয় পরমাণু পুঞ্জের পরস্পর আকর্ষণ প্রভাবে তাহাদের উৎপত্তি হইয়া থাকে, এই সকল পদার্থের আকার ও বৃহত্ত্বের কোন ইয়ত্তা নাই। চতুষ্কোণ, ত্রিকোণ, গোলাকার, ডিম্বাকার, এক ছটাক, এক সের ও মণাধিক সকল প্রকারই হইতে পারে। মৃৎপিণ্ড, প্রস্তর-ধাতুখণ্ড প্রভৃতি এক জাতীয় পরমাণু সকলের সমষ্টি। ঐ সকল বস্তুর পরমাণু উপর্য্যুপরি নিবেশিত হইয়া কিমিয়াকর্ষণ দ্বারা একত্রহিয়াছে। যে অবস্থাতে এই আকর্ষণের ক্রিয়া ঘটিবার সম্ভাবনা আছে, সেই অবস্থাতে পরমাণু সংযোগে তাহাদের আকার আরো পরিবর্দ্ধিত হইতে পারে। এমন কি, ঐ সকল পরমাণুক পৃথক্ করিয়া দিলে আকর্ষণ ক্রিয়ার দ্বারা পূর্ব্বাকার পুনঃপ্রাপ্তি অসম্ভব নহে। মৃৎপিণ্ড চূর্ণ করতঃ ধূলিবৎ করা যায়, এই অবস্থাতে ইহার পরমাণু সকলের আকর্ষণ থাকা অনুভব হয় না। কিন্তু ইহার আকর্ষণ অনুকূলক অবস্থাতে রাখিলে যেমন কিঞ্চিৎ জল নিশ্রিত করিলে তাহারা পুনরায় পিণ্ডাকার

প্রাপ্ত হয়। এইরূপ ধাতুখণ্ডে পরমাণু অধিক শক্তি-সহকারে পৃথক্ করিলেও উত্তাপের সাহায্যে পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হয়। পদার্থবিৎ পণ্ডিতেরা এই সকল বস্তুকে জড় বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অন্য রূপ পদার্থ আছে তাহার শরীর বিশেষ হইতে নির্গত হইয়া বর্দ্ধিত হয়, অবশেষে ধ্বংস হয়, এই সকল বস্তুকে শরীরি বস্তু বলা যায়। ইহারা পূর্ব্বোল্লিখিত বস্তুচয়ের মত বৃদ্ধি পায় না। শরীরি পদার্থের শরীরের উপর যদি সহস্র বৎসর পর্য্যন্তও পরমাণু সকল ঘর্ষিত কি প্রলেপিত হয়, তাহা হইলেও তাহার শরীরের এক পরমাণু বৃদ্ধি পায় না। কেবল মাত্র আহারের পরিপাক দ্বারা ইহাদের শরীর বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। অতএব শরীরান্তর হইতে উৎপত্তি এবং আহার পরিপাক দ্বারা বৃদ্ধি, শরীরি পদার্থের স্বতঃসিদ্ধ ধর্ম্ম। ইহাদের সৃষ্টি রাসায়নিক আকর্ষণাদি ভৌতিক নিয়ম দ্বারা হওয়া দূরে থাকুক, বরং ঐ সকল নিয়মের প্রতিরোধে যাহাকে আমরা জীবন বলি ঐ অনন্তভূত শক্তির সাহায্যে হইয়া থাকে। কারণ এই জীবনী শক্তির ঐ ভাবেই ঐ ভৌতিক নিয়ম সকল শরীরের পরমাণু পুঞ্জের উপর কার্য্য করিতে আরম্ভ করে; এবং তদ্দ্বারাই জীব দেহের বিনাশ ও পরমাণু সংযোগের ধ্বংস হয়। তাহারা অন্য পদার্থ সকলের সহিত সংমিলিত হইয়া নূতন পদার্থ উৎপন্ন করে। যদি জীব-

শরীর পূর্ব্বমত ভৌতিক নিয়ম দ্বারা নিবেশিত হইত, তাহা হইলে ইহার আকার ধ্বংস হইবার সম্ভাবনা ছিল না। ধাতুখণ্ডও মৃৎপিণ্ডবৎ একাকারেই থাকিত, অথবা কারণ বিশেষে বিকার প্রাপ্ত হইলেও ঐ সকল নিয়মানুসারে পূর্ব্বকার প্রাপ্তির অসম্ভাবনা ছিল না। ইহার দ্বারাই জড় ও শরীরি পদার্থে যে প্রভেদ, তাহা অনায়াসেই বোধগম্য হইবে।

গতি-শক্তি যে পদার্থের গুণ নহে, পূর্ব্বে ইহা প্রদর্শিত হইয়াছে, এক্ষণে ইহাও দেখান গেল যে জীবনীশক্তিও ভৌতিক গুণ নহে। ইহার পর পৃথিবীতে ভূত কি, ভূতের গুণ ব্যতীত আর কিছুই নাই, এই কথাটিতে অনেকে আর বিশ্বাস করেন না, এবং আত্মা কি মনঃ নামে অন্য কোন পৃথক্ বস্তু থাকিতে পারে, বোধ করি এ বিষয়ও একেবারে অসম্ভব বোধ হইবেক না। এই-ক্ষণে আত্মার সত্তাতে বিশ্বাস জন্য কি কি নিশ্চিত প্রমাণ প্রতীয়মান রহিয়াছে, তাহার পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা যাউক। কিন্তু সেই সকল প্রমাণ প্রয়োগের পূর্ব্বে ইহা বিবেচনা করা কর্ত্তব্য, যে কোন বিষয়ে কি প্রকার প্রমাণ প্রয়োগের সম্ভাবনা আছে। অনেক বস্তু অস্মদাদির ইন্দ্রিয়-গোচর, সুতরাং সেই সকল বিষয়ে দ্বিধা জন্মিলে, তৎখণ্ডন পক্ষে ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষতাই প্রচুর প্রমাণ। আকাশ নীল বর্ণ কি পীত বর্ণ ইহার বিষয়ে তর্ক হইলে কিছু কোন যুক্তি কি

প্রমাণ দ্বারা মীমাংসা হইতে পারে না। এস্থলে ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষতাই সন্দেহ ভঞ্জনের এক মাত্র উপায়। ক্ষেত্র-বিদ্যা প্রভৃতি আবার কতিপয় বিষয় আছে, যে তাহারা প্রত্যক্ষীভূত না হউক তথাপি তাহাদের সম্বন্ধে যৌক্তিক প্রমাণই এমত পরিশুদ্ধ রূপে প্রদর্শিত হয়, যে ঐ সকল স্থলে দুই মত হইবার সম্ভাবনা নাই। মনঃ কিছু ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বস্তু নহে, সুতরাং ইহার সত্ত্বার পক্ষে ইন্দ্রিয়ের সাক্ষ্যতা প্রাপ্তির অসদ্ভাব। ইহা কিছু ক্ষেত্রবিদ্যা কি গণিত শাস্ত্রের পরিমাপক সংখ্যার ন্যায় নহে, যে তাহা নিরবচ্ছিন্ন যুক্তি এবং প্রত্যক্ষ দ্বারা প্রমাণীকৃত হইবে। কিন্তু এই দ্বিবিধ প্রমাণ প্রাপ্তি অভাবে আমাদের যদি অবিশ্বাস করিতে হয়, তাহা হইলে পৃথিবীতে অতি স্বল্প বিষয় আছে, যে তাহাতে অস্মদাদি বিশ্বাস করিতে পারি। পদার্থের সত্ত্বা বিষয়ে আবাল বৃদ্ধ সকলের দৃঢ় প্রত্যয় আছে। তাহাও কিছু ইহার অন্তভবের দ্বারা প্রমেয় এমত নহে।

পাদার্থের গুণের সত্ত্বার জন্যে কেবল ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় নতুবা ইহার অস্তিত্ব কিছু ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য হয় না। তবে যে ইহাকে প্রত্যক্ষীভূত গুণ সকলের অপ্রত্যক্ষীভূত আধার রূপে বিশ্বাস করিয়া থাকি, তাহা স্বভাব-সিদ্ধ সংস্কার বটে। মনের ক্রিয়া কি গুণ সকলও সেইরূপ অনুভূত হইতেছে।

আমরা মনকে দেখি না, কিন্তু অনুমিতি, উপমিতি, চিন্তা, দয়া, হর্ষ, বিমর্ষ, আশা প্রভৃতি মনের কার্য্য কি গুণ সর্ব্বদা দেখিতেছি। এই সকল অনুমেয় গুণ স্বত্বে অপ্রত্যক্ষীভূত মনের সত্বা যদি বিশ্বাসের আস্পদ না হয়, এতন্ন্যায়ে প্রত্যক্ষীভূত গুণ সকল দ্বারা তাহার আধারস্বরূপ অপ্রত্যক্ষীভূত পদার্থের কল্পনাও যুক্তি-সিদ্ধ বলা যায় না। ইহা দ্বারা সপ্রমাণ হইতেছে যে পদার্থের সত্বাতে বিশ্বাস জন্য যেরূপ হেতু আছে, মনের সত্বাতে প্রত্যয়ের কারণ তদপেক্ষায় অধিক না হই-লেও তুল্য প্রমাণ প্রদর্শন করা যায়। অপর অদৃশ্য বিষয়ে বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইলে একটি কথা স্মরণ রাখা আবশ্যক. যে গুণ লক্ষ্য করিয়া অদৃষ্ট বস্তুর অনু-ভব করিতে হয়, তাহারা যদি বিভিন্ন স্বভাব দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে তত্তৎ গুণোপেত বস্তুও পৃথক্ হইবে, ইহার কিছু সন্দেহ নাই।

মনের গুণ উপমিতি, অনুমিতি প্রভৃতি পদার্থের গুণ হইতে পৃথক্ কি না? পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে।— কেবল ইহা কেন? পদার্থের গুণ সকল চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসিকা প্রভৃতি বহিরিন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য, মনের গুণ সকল কেবল অন্তরিন্দ্রিয়ের গোচর, যখন গুণ সকল পৃথক্ এবং তাহাদের বিজ্ঞান-প্রণালীও বিভিন্ন, তখন ঐ সকল গুণাশ্রিত পদার্থও যে পৃথক্ ও বিভিন্ন হইবে, এতদ্রূপ জ্ঞান করা যুক্তিসম্মত কি না? নতুবা এক

জাতীয় গুণের পরিজ্ঞান জন্য দুই প্রণালী কল্পনা করা গৌরব ও অনাবশ্যক বোধ হইতেছে। পূর্ব্বে আমরা বলিয়াছি, যে পদার্থের সত্ত্বা বিশ্বাস পক্ষে যেরূপ হেতু দেখান যায়, আত্মার অস্তিত্ব প্রত্যয় করিবার জন্যও সেই রূপ যুক্তি ও প্রমাণ আছে। এইক্ষণে ইহা প্রদর্শন করা যাইতেছে, যে আত্মার সত্ত্বাতে বিশ্বাসের জন্য অধিক হেতুর নির্দ্দেশ করা যায়, পদার্থের সত্ত্বাতে বিশ্বাসের স্থৈর্য্যভাব নিমিত্ত দুই তিনটি বিষয় অপরিবর্ত্তিত রূপে বর্ত্তমান থাকা আবশ্যক করে। ইহা উদাহরণ দ্বারা বিশেষ স্পষ্ট হইবে। রূপ, অস্মদাদির চক্ষুর্গ্রাহ্য বলিয়া রূপবিশিষ্ট পদার্থের সত্ত্বাতে বিশ্বাস হইতেছে। কিন্তু যদি তেজঃপদার্থের অভাব হয় তাহা হইলে আমাদের চক্ষুঃ থাকা স্বত্বেও রূপের প্রত্যক্ষ হয় না, সুতরাং পদার্থের সত্ত্বার পক্ষে রূপ থাকাও যে একটি প্রমাণ ছিল, তাহাও রহিত হয়। এই রূপ বিস্তার, কাঠিন্য প্রভৃতি যদি আমাদের প্রত্যক্ষ করিবার সাধ্য না থাকে, তাহা হইলে পদার্থ বর্ত্তমান থাকুক, বা না থাকুক, ইহার সত্ত্ব সপ্রমাণ করা অসাধ্য হইয়া উঠে। সুতরাং তাহাতে বিশ্বাস থাকে না, কিন্তু আত্মার সত্ত্বার পক্ষে সে আশঙ্কা সম্ভবে না। আমি অনুমান করিতে পারি, বিচার করিতে পারি, সুতরাং বর্ত্তমান আছি। এই ন্যায় কিছু বাহ্য বস্তুর সত্ত্বার উপর নির্ভর করে না। যদি সমুদায় জড় পদার্থ নষ্ট

হইয়া যায়, তাহা হইলেও এরূপ চিন্তার লাঘব হইবার সম্ভাবনা নাই। তদবস্থাতেও এতদ্ যুক্তি অনুসারে আত্মার সত্ত্বা প্রতি প্রশ্ন করা যাইতে পারে। সুতরাং গুণের প্রত্যক্ষতার অভাবে পদার্থের সত্ত্বাতে বিশ্বাস, যেরূপ নষ্ট হইয়া যায়, সেরূপ আত্মার সত্ত্বাতে বিশ্বাস ধ্বংস হইবার সম্ভাবনা নাই। চিন্তা, অনুমান, উপমান প্রভৃতির দ্বারাই ইহার সত্ত্বার সপ্রমাণ হইবেক। আপনার সহিতই বিন্যস্ত হইয়া রহিয়াছে, ইহার দ্বারাই উপলব্ধি হইতেছে, যে পরিবর্ত্তন পদার্থের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম পদার্থের সত্ত্বার বিষয়েও যাহার কর্ত্তৃত্ব অবধারিত হইল, আত্মা তাহার অনুশাসনের অধীন নহে। এই গুণ থাকাতেই আত্মা, জগদ্ব্যাপী, অচিন্ত্য, অনাদি, পরম করুণাময় পিতার স্বভাবের সহিত উপমেয় ইহার প্রভাবেই মনুষ্য পরমেশ্বরের প্রতিরূপে নির্ম্মিত হইয়াছে। এই কথাটি কেবল প্রশংসা-সূচক রূপক বাক্য মধ্যে গণ্য না হইয়া বিশ্বাস-ভাজন হইতেছে। এই গুণ আছে বলিয়াই আমরা এরূপ ভরসা করিতে পারি, যে, যে কালে ভৌতিক কার্য্য সকল বিনাশ প্রাপ্ত হইবে, চন্দ্র সূর্য্য নক্ষত্রাদি যখন বিলুপ্ত হইবে, যে কাল এই ভূলোক দ্যুলোক প্রভৃতির কোন চিহ্নই থাকিবে না, কেবল মাত্র ইহার বিগত কালে বর্ত্তমান ছি , এই রূপ অবগতি স্মৃতি-পথে অস্পষ্ট রূপে উপ ... বে, তখনও আত্মা ইহার

জনকের সহিত বিমলানন্দ উপভোগ করিবে। এই আশা অযৌক্তিক নহে, স্বপ্নবৎ অলীকও নহে, ইহা আমাদের আত্মাতে স্পষ্টাক্ষরে খোদিত রহিয়াছে, ইহাতে বিশ্বাস না করা কাহারো সাধ্য নাই।

বিদ্যা-শিক্ষাকালে ধর্ম্মনীতি শিক্ষা করা কর্ত্তব্য।

বিদ্যা-শিক্ষা কালে ধর্ম্মনীতি শিক্ষা করা যে নিতান্ত প্রয়োজনীয়, ইহা সর্ব্বদেশীয় পণ্ডিতগণের মত ও যুক্তিসিদ্ধ। ধর্ম্ম যে মনুষ্যের প্রধান সম্পদ ও পরম গৌরবের বিষয়, একথা মুক্তকণ্ঠে সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন; যদিও আমাদের প্রকৃতি-ভূমে ধর্ম্ম-বীজ নিহিত আছে, তথাচ যে তাহা শিক্ষা এবং অভ্যাস করা নিষ্প্রয়োজনীয়, একথা যুক্তিসম্মত নহে। ধর্ম্মের বীজ সকল মনুষ্যের চিত্ত-ভূমিতেই আছে, সাধু-সঙ্গ সদুপদেশ রূপ কর্ষণ ও আলোচনারূপ বারি সিঞ্চন করিলেই ক্রমে ক্রমে অঙ্কুরিত হইয়া শাখা প্রশাখা বর্দ্ধিষ্ণু হইয়া থাকে। নানা কারণে ধর্ম্মবীজ আমাদের চিত্ত ক্ষেত্র হইতে উন্মূলিত হইতে পারে। কিন্তু এক কালে আমাদের অন্তরে ধর্ম্মবীজ না থাকা স্বীকার করা যাইতে পারে না। যদি এক কালে বীজ না থাকে, তবে কর্ষণ দ্বারা কখনও তাহাতে বৃক্ষ জন্মে না।

কর্ষণের ন্যূনাতিরেকে ফলের হ্রাস বৃদ্ধি হইতে পারে, কর্ষণ দোষে বীজ নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। কিন্তু কেবল কর্ষণ দ্বারা বৃক্ষাদি জন্মে না, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। অনেকে পাপাচরণ করিতে করিতে তাহার নিকৃষ্ট বৃত্তি সকল এমনই প্রবল হয়, যে তাহার কখনও আত্মগ্লানি ও গতানুশোচনা রূপ অন্তর্দাহের উদ্রেক হয় না। এমন স্থলে আমাদের এরূপ বিবেচনা করা উচিত নয় যে, পরমেশ্বরই তাহাকে নিষ্ঠুর করিয়া সৃজন করিয়াছেন। একপ স্থলে ইহা বলা অসঙ্গত হইবে না যে, পাপাচরণ করিতে করিতে নিকৃষ্ট বৃত্তি সকল প্রবল হইয়া অভ্যাস-দোষে তৎযাতনা-জনিত ক্লেশের ক্রমে ক্রমে হ্রাস হইয়া ঐ পাপাচরণ করিতেই তাহার সুখ বলিয়া মনে করে। পাপীরও তদ্রূপ অপরাপর রোগ হইতে মুক্ত হওয়ার ইচ্ছা জন্মে, কিন্তু এ রোগ হইতে মুক্ত হওয়ার প্রবৃত্তি হয় না। "যেমন প্রস্তরের উপরে খড়্গাঘাত করিতে করিতে ঐ খড়্গের ধার মন্দীভূত হয়, তদ্রূপ উক্ত উৎকৃষ্ট বৃত্তির চালনাভাবে প্রোক্ত বৃত্তি সমুদয় দুর্ব্বল হইয়া নিকৃষ্ট বৃত্তি সমুদয় প্রবল হয়।" আমরা যে অঙ্গ যখন অধিকরূপে চালনা করি, তখনই সেই অঙ্গ চালনে বিশেষ সুখ বোধ করিয়া থাকি। এই প্রকৃতির সাধারণ নিয়মে, প্রোক্ত কারণে কুপ্রবৃত্তি সকল চালাইতেই অধিক সুখ হয়, কাজেই তাহাতে

রত হই। প্রাচীন পণ্ডিতেরা বলেন, মনুষ্যের নানা-বস্থ, তাহার প্রথমাবস্থায় বিদ্যাপার্জ্জন করিবে দ্বিতীয় অবস্থায় ধনোপার্জ্জন, তৃতীয়ে পুণ্যোপার্জ্জন করিবে। এই মত যে কি পর্য্যন্ত ভ্রান্তিমূলক, তাহা প্রমাণ করিবার নিমিত্ত অধিক প্রয়াস পাইতে হয় না। হিতোপদেশ-কর্ত্তা লিখিয়াছেন, প্রাজ্ঞ লোক অজর ও অমরের ন্যায় হইয়া বিদ্যা ও অর্থ চিন্তা করিবে, ও যম কর্ত্তৃক কেশে গৃহীতের ন্যায় ধর্ম্মাচরণ করিবে। ঐ সুধামাখা উপদেশানুযায়ী বর্ত্তমান কালকে শিক্ষার কাল স্থির করিয়া ভাবী কাল প্রতীক্ষায় অনর্থকাল ক্ষয় না করিয়া বিদ্যাশিক্ষার সময়াবধি ধর্ম্মশিক্ষায় যত্নবান হওয়া বিধেয়। মৃত্যু কালের নির্ণয় নাই। প্রিয় ভ্রাতঃ! এখনও শুন, বৃত্তি সকল সবল, চিত্তক্ষেত্র উর্ব্বর অতি নূতন আছে। এখনও অন্য দুর্নীতি-পিশাচ যাইয়া তোমাদের হৃদক্ষেত্র খানি কুনীতি কণ্টকে নষ্ট না হয়, তৎপক্ষে যত্নিক হও। প্রথমাবধি আমাদের সাবধান না হইলে কুপ্রবৃত্তি একবার জন্মিলে তাহা হইতে বিরত থাকা বড়ই কঠিন। যেমন শল্ম বৃক্ষ, উহার প্রথমাবস্থায় নখ দ্বারাই মূলশুদ্ধ উন্মূলন করা যায়, কিন্তু বহুদিন গতে শতহস্তী দ্বারাও তাহার মূলোৎপাটনে সাধ্য হয় না। আমাদের কুপ্রবৃত্তিতে প্রীত হওয়াও তদ্রূপ, ক্রমশঃ দৃঢ়ীভূত হয়। যখন হৃদয়ে মন্দ বুদ্ধির অঙ্কুর সঞ্চার হইয়া

থাকে, জ্ঞানাস্ত্র দ্বারা তাহা ছেদন করিলে, কুনীতি-কণ্টক আর বৃদ্ধি হইতে পারে না। সুতরাং অবশ্য সেই ধর্ম্মরূপ মনোহর বৃক্ষে অমৃতময় ফল উৎপন্ন হইবে। অতএব যে কর্ম্ম কর্ত্তব্য কর্ম্ম, তাহা আমাদের ভাবী কালের জন্য, অনুষ্ঠানে বিরত থাকা কদাপি বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য নহে। অনেকে মনুষ্যদের বুদ্ধি বৃত্তির প্রাধান্য দেখিয়া মানব জাতির অপরাপর জীব-অপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিয়াছেন। পশু পক্ষী, সিংহ হস্তী, জলচর, খেচর কত প্রকার জীব আছে,— পাতাকে জানিতে পারে না। তাহারা তৎপ্রসাদাৎ সঞ্চারণ করিতেছে, অথচ তাঁহার প্রসাদ অনুভব করিতে পারে না। তাহারা তাঁহার কার্য্য সম্পন্ন করিতেছে, কিন্তু না জানিয়া কার্য্য করিতেছে। মনুষ্যেরই এই প্রশস্ত উন্নত অধিকার, যে জানিয়া শুনিয়া আপন ইচ্ছাতে তাঁহার মঙ্গল অভিপ্রায়ে যোগ দিতেছে। সূক্ষ্মরূপে বিবেচনা করিয়া দেখিলে ইহাই অবধারিত হইবে, যে মনুষ্যবর্গ প্রতি কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদনের যে গুরুতর ভার পরমেশ্বর কর্ত্তৃক অপিত আছে, এবং মনুষ্যকে স্বাধীন করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। অন্যান্য পশ্বাদি সদৃশ, মনুষ্য যন্ত্রের ন্যায় নহেন, তাঁহাদের উপর যে সমস্ত কার্য্যের ভার ন্যস্ত আছে, তৎকার্য্য সাধনে যতদূর কৃতকার্য্য হইবেন, ততই মনুষ্য নামের উপযুক্ত হইবেন, ততই করুণা-নিধানের উদ্দেশ

সাধনে যত্নশীল বলিয়া মনুষ্য-সমাজে সমাদৃত এবং পরমেশ্বরের নিকট পুরস্কার-পাত্র বলিয়া পরিগণিত হইবেন। মনুষ্যের জ্ঞানাধিক্যও কেবল উক্ত কর্ত্তব্য সাধনের উপযোগী বলিয়াই অনুভূত হইতেছে। ইহা দেখা যায়, যে পরমেশ্বর মনুষ্যদিগকে কর্ত্তব্য কর্ম্ম সাধনের জন্য যত দূর জ্ঞানের উন্নতির প্রয়োজন, তাহাই প্রদান করিয়াছেন, তাহার অধিক অণুমাত্রও দেন নাই। ইহার প্রমাণ এই যে প্রাকৃতিক নিয়ম অর্থাৎ গুহ্য কারণ সমূহের ফল প্রত্যক্ষ অনুভব করার উপযুক্ত জ্ঞান পরমেশ্বর আমাদিগকে প্রদান করিয়াছেন। আমরা আকর্ষণ শক্তি অর্থাৎ কারণের ফল দৃষ্ট করি, এইরূপ অন্যান্য প্রাকৃতিক ফল কি কার্য্য অনুভব করিতে সমর্থ হই, কারণ এই সকল নিয়ম অবগত থাকা মনুষ্যের কর্ত্তব্যকর্ম্ম সম্পাদন করা পক্ষে আবশ্যক হইয়াছে। কিন্তু কি কারণ ঐ সকল কার্য্য অথবা ফল হইয়া থাকে, তাহা আমরা জানি না। এতদ্বিষয়ে সহস্র বৎসর পূর্ব্বে আমরা যেরূপ অজ্ঞ ছিলাম, এখনও তদ্রূপই আছি, এবং অব্দ-শতান্তেও অনভিজ্ঞ থাকিব। কারণ জ্ঞান আমাদের কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান-পক্ষে প্রয়োজনীয় নহে, সেই হেতুতেই তাহা আমাদের জ্ঞানগম্য নহে। অতএব আমাদের জ্ঞানের সীমা যে কর্ত্তব্য কর্ম্মের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া রহিয়াছে, ইহা অনায়াসেই অনুভব করা যাইতে পারে।

অতীব ধীশক্তিসম্পন্ন মনুষ্যগণ যে সমস্ত অভূত-পূর্ব্ব আবিষ্ক্রিয়া দ্বারা জন-সমাজ চমৎকার করিতেছেন, তদ্দ্বারা পরমেশ্বরের অসীম-শক্তি, অনন্ত কৌশল প্রকাশ, অথবা মনুষ্য পরিবারের ভাবী সুখ ও উন্নতি সাধনের সম্ভাবনা না থাকিত, তাহা হইলে যে ঐ সকল আবিষ্ক্রিয়া ব্যর্থ ও কৌতুক-পরবশ, বালস্বভাব, বৃদ্ধের ক্রীড়ার উপকরণ ব্যতীত আর কিছুই ছিল না, ইহার আর সন্দেহ নাই। যখন জ্ঞান-প্রবীণ ব্যক্তির কীর্ত্তি ও যশঃ কেবল জ্ঞানবিশিষ্ট ব্যক্তিমাত্রেরই বোধগম্য দেখা যায়। কিন্তু যে ব্যক্তি কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা যশস্বী হইয়াছেন, তাঁহার মাহাত্ম্য আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা জ্ঞানী ও মূর্খ সকলেই এক প্রকার অনুভব করার ক্ষমতা পরমেশ্বর হইতে প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহা দ্বারাই যে শেষোক্ত ব্যক্তির প্রাধান্য জন-সমাজে অধিক আবশ্যকতা ইহা অনায়াসেই প্রতীতি হইবেক। অপিচ কর্ত্তব্য কর্ম্মের জ্ঞান যে অস্মদাদির পক্ষে বিজ্ঞা-নাদি শাস্ত্রাপেক্ষা অধিক প্রযোজনীয়, ইহা অন্য প্রকা-রেও দেখা যায়। আমরা জ্ঞানোন্নতি দ্বারা জন-সমাজে সমাদৃত হই বটে, কিন্তু কর্ত্তব্য কর্ম্মের ত্রুটি আমাদের পক্ষে লোকতঃ ও ধর্ম্মতঃ যেরূপ দূষ্য বলিয়া গণ্য, বি-জ্ঞান শাস্ত্রাদির অভাবে তদ্রূপ নহে। জ্ঞানের অভাবকে মুর্খবলে, কিন্তু তজ্জন্য কোন প্রত্যবায় নাই। কর্ত্তব্য কর্ম্মের ত্রুটি পাপ বলিয়া গণ্য হয়। তজ্জন্য কি

বিদ্বান্ কি মূর্খ সকলেই দোষী। কর্ত্তব্য শব্দটি সাক্ষাৎ পরমেশ্বরের আজ্ঞাস্বরূপ। ইহা মনুষ্যকৃত নহে। মনুষ্য ভাবের স্রষ্টা নহেন। মনুষ্যে স্বতঃসিদ্ধই এই ভাবটি নিহিত ছিল, ভাষা দ্বারা সেই ভাবটি প্রকাশ পাইয়াছে। যখন বলি একথাটি আমার কর্ত্তব্য, অতএব করিব, একথাটি মনের ইচ্ছা অনিচ্ছার উপর নির্ভর করে না। তখন যেন অন্য কোন মহাপুরুষ কর্ত্তব্য শব্দ রূপ উপদেশামৃত দ্বারা আমাদের মন সিক্ত ও তত্ত্বৎ কর্ম্মে নিযুক্ত, এবং অকর্ত্তব্য নিষেধ করিতেছেন। কর্ত্তব্য সাধনে প্রভু বিরক্ত হন হইবেন, অজ্ঞ লোকে নিন্দা করে করিবেক, এইরূপ দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়া কর্ত্তব্য সাধনে তৎপর, তিনি যথার্থ মনুষ্য ও গৌরবের পাত্র বটেন। আমরা যদি কেবল উপদেশ শ্রবণ মাত্র করি, গৃহ কর্ম্ম সময় তাঁহাকে বিস্মৃত হই, তবে আমাদের কি হইল! যদি বিষয় কার্য্য সময় আমাদের গৌরবের কারণ স্মরণ না থাকে, তবে পুস্তক পাঠের ফল কি? তাহারা কি এখানে কেবল আহার, নিদ্রা, ভয়, ক্রোধে বিষয় অর্জ্জনে মান-সম্ভ্রমে, যশোবিস্তারে ধনসংগ্রহেই মুগ্ধ হইয়া পরমায়ুর সমস্ত কাল হরণ করিবেন? তাঁহারা সেই মঙ্গল-নিকেতন ত্যাগ করিয়া কি রূপে ভদ্রমানের যোগ্য হইবেন? হে মনুষ্য! তোমার শুনিবার উপায়ের অভাব নাই। জ্ঞান দ্বারা অনেকে বুঝিয়াছে। তবে জ্ঞান ও কার্য্য বিশ্বাস আচরণে কেন মিলিত না।

কর। তোমরা সদনুষ্ঠানে অদ্য হইতেই কেন প্রবৃত্ত না হও, পুণ্যের মনোহর গুণ শ্রবণ বা কীর্ত্তন করিলে কি হইবে? পুণ্যের মধুরভাব অনুষ্ঠান না করিলে অনুভব হয় না। চিনির মধুরত্ব কিছু কেবল ব্যাখ্যা দ্বারা হৃদয়গত হইতে পারে না। ভূরি ভূরি প্রাচীন কবিতা বা সদুপদেশ কণ্ঠস্থ করিলে কি হইবে? পুণ্যানুষ্ঠান না করিলে অভ্যস্ত হয় না, অভ্যাসের এমনই প্রভা যে শত শত সদুপদেশও অভ্যাস-দোষে সম্যক্ ফলোৎপাদন করিতে পারে না। দেখুন, অতি ক্ষুদ্র কর্ম্মও যখন অভ্যাস ব্যতীত কেবল উপদেশ মাত্রে সিদ্ধকাম হয় না, এমত স্থলে এমত মহৎ বিষয়ে বিনাভ্যাসে কেবল উপদেশে লাভ করিবেন, এমত বিচার-সিদ্ধ হয় না। দেখুন অভ্যাস কি বলবত্তর! মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম যাঁহারা কিছু মাত্র অবগত নহেন, তাঁহারাও অভ্যাস-বলে অল্লায়াসে মহৎকার্য্য সকল করিতেছে। যথা—এক গাছি বজ্জুপরি কি রূপে গুরুতর ভার সহকারে বাজীকরেরা অঙ্গভঙ্গি পূর্ব্বক গমনাগমন করিয়া দর্শকগণকে অদ্ভূত আনন্দরসে অভিভূত করে। যখন এতদ্রূপ কার্য্য সকল বিনাভ্যাসে হইতে পারে না, তখন যে তদপেক্ষা সহস্রগুণ উৎকৃষ্টতর গুরুতর অমূল্য ধর্ম্ম কেবল উপদেশেই লাভে অধিকারী হইবে, একথা কি রূপে স্বীকার করিতে পারি। ধর্ম্ম মনুষ্যের স্বভাব-সিদ্ধ গুণ নহে, উহা কর্ত্তব্যানুষ্ঠানের ফলের সমষ্টি

বটে। কেবল এইমাত্র বলা যাইতে পারে, যে মনুষ্য স্বাধীন জীব, তিনি যত্ন করিলেই তাহা লাভ করিয়া মনুষ্য নামের রক্ষা করিতে পারেন। নতুবা মনুষ্যদিগের ধর্ম্ম প্রবৃত্তি আছে বলিয়াই গৌরবের পাত্র নহেন। ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। অজ্ঞানতা মোচন-প্রত্যক্ষ উপায় জ্ঞানোপদেশ। সেই জ্ঞান লাভ করিয়াও যে ব্যক্তি প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক জ্ঞান-বিরুদ্ধ কার্য্যই করিবেক, তাহার আর উপায় কি? জাগ্রত হইয়াও যে ব্যক্তি আপনাকে সুসুপ্তাবস্থার ন্যায় দেখায়, তাহাকে চৈতন্য করিবার কাহার সাধ্য? মনুষ্য এ পৃথিবীতে ধর্ম্মজীবী জীব বলিয়াই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জীবরূপে কল্পিত হইয়াছেন, যে সেই মহৎ অধিকার সৎসঙ্গে সদুপদেশ, সৎকর্ম্ম অভ্যাসদ্বারা ক্রমশঃ অভ্যস্ত ও আয়ত্ত না করি, তবে কিরূপে সেই মহত্ত্ব লাভে অধিকারী হইতে পারিব। এমত মহৎ অধিকার হইতে চ্যুত হইলে, মনুষ্য ও পশুতে কি প্রভেদ থাকে? অতএব, চিত্তশোধন নিমিত্ত যে আত্ম-সন্ধায়িনী চরিত্র-শোধিন প্রভৃতি উৎকৃষ্ট বৃত্তি সমুদয় মনোবৃত্তিকে সমধিক তেজস্বিনী করা গুরুতর কর্ম্ম বটে। অধুনা রাজকীয় বিদ্যালয় সমূহে যে প্রণালীতে অধ্যাপন কার্য্য নির্ব্বাহ হইতেছে, তাহাতে যে নীতি বিদ্যাশিক্ষা হয় না, এমত বলা যায় না, কিন্তু যে প্রকার ফলোৎপন্ন হইতেছে, তাহাতে এতদ্দেশীয় লোকের উন্নতি দর্শনেচ্ছু মহা-

শযেরা তৃপ্ত নহেন। বিদ্যালযে পাঠাবস্থায অনেক যুবা স্বীব সাধু ব্যবহাবেব পবিচয দিযা থাকেন। কিন্তু বিদ্যালয় হইতে বহিষ্কৃত হইবা মাত্র তাঁহাদের আর সেরূপ সাধুতা, বিশুদ্ধ চিত্ত দেখিতে পাই না। তখন তিনি সংসারে লিপ্ত হন, তখন বাক্যে বা কার্য্যে এরূপ বোধ হয না যে, তিনি কখনও কোন গ্রন্থালোচনা বা উপদেশ শ্রবণ কবিযাছেন। আমবা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, কত সুবিজ্ঞ ছাত্র সংসর্গদোষে দূষিত হইয়া আপনার পবিত্র চবিত্রকে কলুষিত করিয়াছেন। কত কৃতবিদ্য মহাশযেবা লোকানুবাগ, বা লোকবঞ্চনার্থে কত মত কপটতা প্রকাশ কবিযা দশেব নিকট যশের ভাজন হইবাব নিমিত্ত কুকাজ-লিপ্ত হইতেছেন। কোথাও স্বীয ইন্দ্রিয় সুখানুবোধে কুকর্ম্মকে আর কুকর্ম্মই জ্ঞান করেন না, মিথ্যা কথন কপটাচরণ তাঁহাদেব অঙ্গেব ভূষণ হইযাছে। ইহাতে আমাদেব মনে এ প্রশ্নটি আসিযা উদয হয, যে এতাদৃশ বিদ্বান্ কৃতবিদ্যেবাও যে এতাদৃশ গর্হিত কুকর্ম্মে লিপ্ত হন, ইহাব কারণ কি ? এবিষযেব মূলানুসন্ধান কবিতে গেলে, ইহাই প্রতীতি হইবে যে, ধর্ম্মনীতি, কেবল তাঁহাদেব মৌখিক শিক্ষামাত্র, উপদেশ আচবণে বিশ্বাস কার্য্যে পবিণত কবাব জন্য তাঁহাবা কখনই যত্ন কবেন নাই—অভ্যাস কবেন নাই—পুণ্যেব মনোহব গুণ কীর্ত্তন বা বর্ণন বা শ্রবণ মাত্র করিযাছেন,—বাস্তবিক পুণ্যের

মনোবৃত্ত ভাব হৃদ্গত হয় নাই, তবেই বলিতে হইবে যে বিদ্যালয়ে নীতি-বিদ্যা শিক্ষার প্রণালী আরো পবিশুদ্ধ রূপে স্থাপন করা বিহিত হইয়াছে। অনেকে এরূপ আপত্তি করিয়া থাকেন, যে এতদ্দেশীয় লোকের নীতি-বিদ্যা ও বিজ্ঞান-শাস্ত্রের প্রতি বিদ্বেষ আছে। বাস্তবিক ইয়ুরোপীয় বিজ্ঞান বা নীতি-শাস্ত্রের সহিত, কোন ধর্ম্মেরই বিবাদ বিসম্বাদ নাই, কেন না মিথ্যা কথন, কপটাচরণ, পরানিষ্ট যে পাপ, পরোপকার যে মহাপুণ্য ইহা সকল নীতি ও ধর্ম্ম শাস্ত্রের ঐক্যস্থল। আমাদের দণ্ডনীতি বা ধর্ম্মনীতির অথবা বিজ্ঞান শাস্ত্রের বিপরীত কথা ইয়ুরোপীয় গ্রন্থের মধ্যে দেখা যায় না। যে সকল কথার অসদ্ভাব আছে, তত্ত্বুপদেশে ধর্ম্মের কোন বিপর্য্যই নাই। এমত স্থলে সর্ব্ব ধর্ম্মের ঐক্যস্থল, যথার্থ তত্ত্বউপদেশ দেওনে বাধা কি হইতে পারে। এরূপ কথায় আমাদের ইহা বলিবার উদ্দেশ্য নহে, যে এক্ষণকার বিদ্যালয় সমূহে নীতি-বিদ্যা শিক্ষা হয় না, এমত নহে, ইয়ুরোপীয় লোকেরা যাহাকে প্রকৃত কৃতবিদ্য যুবক বলেন, তৎলক্ষণাক্রান্ত বিদ্বান্ যুবক অতীব বিরল।

পাঠাবস্থায় বালকগণকে যেমন অপরাপর বিষয় শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য, সেইরূপ ধর্ম্মশিক্ষা দেওয়াও আবশ্যক।

শিক্ষা ব্যতিরেকে মনুষ্য কোন বিষয়েই প্রকৃত জ্ঞান লাভ করিতে পারেন না, অনেকের এরূপ ভ্রম আছে, যে মনুষ্যের ধর্ম্মজ্ঞান নিতান্ত উপদেশ সাপেক্ষ নহে, উহা প্রায় প্রত্যেকেরই প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি অনুসারে আপনা হইতেই উৎপন্ন হয়। শৈশবাবস্থায় মনুষ্যকে অন্যান্য বিষয় উপদেশ প্রদান না করিলে সে যেমন তাহাতে সম্পূর্ণ রূপে অনভিজ্ঞ থাকে, ধর্ম্ম বিষয়ে সে রূপ থাকে না। কিন্তু আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, যে শিক্ষার অভাবে অনেক বিদ্বান মনুষ্য উৎকৃষ্ট রূপে ধর্ম্মের মর্ম্ম অবগত হইতে পারেন নাই। শিক্ষার যে কি পর্য্যন্ত শক্তি, তাহা বর্ণনাতীত। মনুষ্য-প্রকৃতি আলোচনা করিলে বিলক্ষণ প্রতীত হয়, যে মনুষ্য বাল্যাবস্থায় যে বিষয়ে শিক্ষালাভ করে, তাহাতেই তাহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি জন্মে। প্রথমাবস্থায়, অপরাপর জ্ঞান শিক্ষার সহিত বালকগণকে ধর্ম্মশিক্ষা প্রদান না করিলে সে সকল বিষয়ে ভয়ঙ্কর অনিষ্ট উপস্থিত হয়, তাহা এস্থলে ব্যক্ত করা সুসিদ্ধ নহে, অনেক প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার তাহা ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থ মধ্যে বিস্তার ক্রমে ব্যক্ত করিয়াছেন।

বিনা উপদেশে মনুষ্য যখন কোন বিষয়েই জ্ঞান লাভ করিতে পারে না, তখন উপদেশ ব্যতিরেকে যে মানব জাতি নিগূঢ় ধর্ম্মতত্ত্বের মর্ম্মাবধারণে সক্ষম হইবে, তাহার সম্ভাবনা কি? অনেকের নিকট হইতে এরূপ আপত্তি শ্রবণ করা যায়, যে পাঠাবস্থায় বালক যখন অন্যান্য প্রকার জ্ঞানশিক্ষা করে, তৎকালে তাহাতে পরমার্থ-তত্ত্বের উপদেশ করিলে, তাহা কোন কার্য্যেরই হয় না। কিন্তু ইহা স্পষ্ট প্রতীত হয়, যে বালকগণকে সাবধান পূর্ব্বক ধর্ম্মোপদেশ করিতে পারিলে তাহা বিশেষ ফলদায়ক হইতে পারে।

পঠদ্দশায় বালকের মনে যখন নানা প্রকার উপদেশ সুশিক্ষার দ্বারা নানা বিষয়ের সংস্কার হইতে আরম্ভ করে, শিক্ষকগণ যদি তৎকালে কোন সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া, তাহাদিগকে পরমার্থ জ্ঞানের উপদেশ করেন, তাহা হইলে সেই সকল ধর্ম্মোপদেশ, তাহাদিগের হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া বসে, এবং তাহা বালহৃদয়ে এমন দৃঢ়ীভূত হইয়া যায়, যে কস্মিন্ কালে সেই সমস্ত উপদিষ্ট ধর্ম্ম-তত্ত্ব, তাহাদের মন হইতে অপনীত হয় না, এবং তাহা ক্রমে অভ্যস্ত হইয়া বিশেষ বিক্রমশালী হইতে থাকে। ঐ সকল ধর্ম্মশাসন তাহাদিগের মনে বিনা আয়াসে স্বতঃই উদয় হয়, এবং তাহারা অনায়াসে ঐ সমস্ত ধর্ম্ম প্রতিপালন-জনিত সুখে সুখী হইতে পারে।

বালকগণকে যেমন অশেষ প্রকার বিজ্ঞান শাস্ত্রের শিক্ষা প্রদান করা আবশ্যক, সেইরূপ তৎসমভি-ব্যাহারে বিজ্ঞানবান্ অনাদিপুরুষেরও জ্ঞান প্রদান করা উচিত। বিদ্যাভ্যাসী বালকগণ যে সময় জ্যোতি-র্ব্বিদ্যা শিক্ষা করতঃ, সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্রাদি আকা-শস্থ অগণ্য পদার্থের সৃষ্টিকর্ত্তা এবং উহাদিগের স্থিতি গতি ও আকৃতির বিধাতা জগদীশ্বরের পরিচয় প্রদান করেন, তাহা হইলে বালকগণ অনায়াসে ঈশ্বরের জ্ঞান-শক্তি, ও করুণার বিষয় জ্ঞাত হইতে সমর্থ হয়। জ্যোতির্ব্বিদ্যা শিক্ষা করণ কালে, ছাত্রগণ যখন জা-নিতে পারে, যে এই প্রকাণ্ড ভূমণ্ডল, সমুদয় জীব জন্তু, বৃক্ষ, পর্ব্বত, নদ, নদী, হ্রদ, সমুদ্র ও বায়ু বাষ্পাদির সহিত অনবরত শূন্যপথে ভ্রমণ করিয়া তিন শত পঁয়-সট্টি দিন ছয় ঘণ্টায় একবার সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করি-তেছে; এবং সূর্য্য হইতে প্রায় নয় কোটি পঞ্চাশৎ লক্ষ ক্রোশ দূরে থাকিয়া ঐ সূর্য্যের আলোক ও উত্তাপ প্রাপ্ত হইতেছে। সূর্য্য পৃথিবীকে অহর্নিশ আকর্ষণ করিতেছে, অথচ পৃথিবী স্বীয় অনির্ব্বচনীয় শক্তি সহকারে সূর্য্য হইতে সততই দূরে স্থিতি করি-তেছে, এবং যে সময় বালকগণ জ্যোতিষের অন্যান্য তত্ত্ব সকল অবগত হয়, শিক্ষক যদি সেই সময় তাহা-দিগকে বিশেষ রূপে অবগত করেন, যে সূর্য্য হইতে পৃথিবীকে যে নিয়মে আকর্ষণ করিতেছে ও যে পরি-

মাণে আলোক ও উত্তাপ প্রদান করিতেছে, তাহার কিঞ্চিৎ মাত্র ব্যতিক্রম হইলে সৃষ্টির সংহার-দশা উপস্থিত হয়, কিন্তু জগদীশ্বর করুণা-প্রসাদাৎ, তাহা কস্মিন্ কালেও ঘটিতে পারে না। তাহা হইলে ছাত্রের মনে সহজেই জগদীশ্বরের করুণার উদয় হয়। এবং স্বতঃই মন হইতে ঈশ্বরের প্রতি ভক্তির উত্থিত হইতে থাকে। শারীর-বিধান ও শারীর স্থান বিদ্যা শিক্ষার সময় ছাত্রকে কেবল শরীরের কৌশল মাত্র উপদেশ না করিয়া তৎসমুদয় কৌশলের কর্ত্তা জগদীশ্বরের জ্ঞান-শক্তি ও করুণার পরিচয় প্রদান করিলে অবশ্যই ছাত্রের মনে ঈশ্বরের মহানুভাব সকল আবির্ভূত হইয়া থাকে। কোন শিক্ষক যখন সৃষ্ট পদার্থের সংযোগ, বিযোগ, ও তাহাদিগের পরস্পর সম্বন্ধ, সাদৃশ্য, ও বৈলক্ষণ্যাদি বিষয়ক তত্ত্ব প্রদর্শন করিয়া ছাত্রগণকে রসায়ন বিদ্যার জ্ঞান প্রদান করেন, তৎকালে যদি তিনি রসায়ন বিদ্যা সম্বন্ধীয় উল্লিখিত প্রকার নিয়মাদি-জনিত কল্যাণের প্রসঙ্গ করিয়া পরমেশ্বরের গুণ গান করেন, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ ছাত্রদিগের হৃদয়ে উৎকৃষ্ট পরমার্থ রস সঞ্চারিত হইতে আরম্ভ করে। এইরূপে প্রত্যেক পদার্থের তত্ত্ব অবগত হইবার সময় বালকগণ যদি ঐ পদার্থের স্রষ্টা ও কৌশলের কারণ জগদীশ্বরের জ্ঞান-শক্তির উপদেশ পায়, তাহা হইলে তাহারা অনায়াসে ঈশ্বরের প্রেমনীরে প্রবেশ করিতে

সমর্থ হয়, এবং অভ্যাস দ্বারা ক্রমে তাহাদিগের পরমার্থ বসে অধিকার জন্মে।

আমাদিগের মনের এইরূপ ধর্ম্ম, যে আমরা যদি উপর্য্যুপরি কোন দুই বিষয় শ্রবণ বা দর্শন বা স্পর্শ করি, তাহা হইলে পুনর্ব্বার ঐ শ্রুত, দৃষ্ট বা স্পৃষ্ট বিষয়ের মধ্যে একের প্রত্যক্ষ দ্বারা অপর বিষয়ও আপনা হইতে মনোমধ্যে উদয় হয়। এবং প্রত্যেক শীত ঋতুতে ক্রমাগত যে সকল পুষ্প-শোভা সন্দর্শন বা ফলের রস আস্বাদন করি, শীত কাল উপস্থিত হইলে ঐ ফল পুষ্পাদি স্বতঃই আমাদিগের মনে আসিয়া উদয় হয়, অথবা অন্য কোন সময় ঐ পুষ্প কি ফল প্রত্যক্ষ করিলেও শীত কালের অনেক ভাব মনে উদয় হইতে থাকে। আমরা যদি ক্রমাগত কোন মনুষ্যের কোন স্থান বিশেষ সন্দর্শন করি, তাহা হইলে ঐ ব্যক্তিকে অন্য কোন স্থানে বা অন্য কোন অবস্থায় পুনর্ব্বার সন্দর্শন করিলেও উহার পূর্ব্বস্থান ও পূর্ব্বাবস্থা আমাদিগের মনে আসিয়া উদয় হইতে থাকে। আমরা পূর্ব্বোক্তস্থান বিশেষ ও অবস্থা বিশেষ প্রত্যক্ষ করিলেও তৎক্ষণাৎ ঐ মনুষ্যকে স্মরণ হয়, আমরা একবার যদি সাগর-তীরে কোন ব্যক্তিকে সন্দর্শন দ্বারা আমাদিগের সাগর-তীর স্মরণ হয়, অথবা আমরা পুনর্ব্বার কোন সময় সেই সমুদ্র-তীরে উপনীত হইলে ঐ মনুষ্যকে স্মরণ করি, অর্থাৎ অব্যবহিত পূর্ব্বাপর কোন

দুই বিষয় একবার আমাদিগের মনে অভ্যস্ত হইয়া গেলে তন্মধ্যে এক বিষয়ের প্রত্যক্ষ দ্বারা বিষয়ান্তরেরও স্মরণ হওয়া আমাদিগের স্বভাব। অতএব বিদ্যা-শিক্ষার অবস্থায় যে সকল পদার্থ-তত্ত্ব অবগত হইতে হয়, ছাত্রগণকে সেই সকল তত্ত্ব-বিষয়ক জ্ঞানোপদেশ করিবার সময় জ্ঞানবান্ আচার্য্য যদি ঐ প্রত্যেক পদার্থ তত্ত্ব উপলক্ষ্য করিয়া ছাত্রদিগকে জগদীশ্বরের জ্ঞানশক্তি ও করুণার শিক্ষা প্রদান করেন, তাহা হইলে তাহাদিগের এমনই একটি অপূর্ব্ব অভ্যাস জন্মিয়া যায় যে, তাহারা যে সময় জ্যোতিষ, রসায়ন, প্রভৃতি কোন প্রকার বিজ্ঞান-শাস্ত্রের সমালোচনা করে, তখনই তদন্তর্গত পদার্থ-তত্ত্বের মধ্যে জগদীশ্বরের অপার করুণা, অনন্ত-শক্তি ও অসীম জ্ঞান প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহার প্রতি ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা-রসে আর্দ্র হয়। জগদীশ্বরের করুণা প্রত্যক্ষ না করিয়া তাহারা ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত কোন কৌশলেরই আলোচনা করিতে পারে না। মনুষ্য অভ্যাসের দাস, যে নিয়ম অভ্যাস করে, তাহারই বশীভূত হয়। অভ্যাস ব্যতিরেকে মানব কোন বিষয়েই সিদ্ধ হইতে পারে না। অভ্যাস দ্বারা অতি সহজ বিষয়ও দুঃসাধ্য হইয়া উঠে, এবং কঠিন বিষয়ও সহজ হয়, অভ্যাসের যে কত দূর পর্য্যন্ত শক্তি, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। অভ্যাসাভাবে মনুষ্যের প্রকৃতি পর্য্যন্ত প্রচ্ছন্ন থাকে, এবং

অভ্যাস-প্রভাবে মানব এক সময় প্রকৃতিকে অতিক্রম করিতেও সমর্থ হয়। মনুষ্য বাল্যাবস্থা হইতে যদি ক্রমাগত ধর্ম্মশিক্ষা প্রাপ্ত হয়, এবং ধর্ম্মালোচনা অভ্যাস করে, তাহা হইলে তাহার ধর্ম্মেতে যাদৃশ শ্রদ্ধা ও অনুরাগ জন্মে, অনভ্যাসে ও অশিক্ষায় কখনই তাদৃশ শ্রদ্ধা ও অনুরাগ উৎপন্ন হইতে পারে না। বিশেষতঃ বালক হৃদয় বসার্দ্র মৃৎপিণ্ডবৎ বাল্যাবস্থায় উপদেশ সকল মনেতে যেমন গাঢ়রূপে অঙ্কিত হয়, যৌবনাদির শিক্ষা কখনও সেরূপ হয় না। বাল্য-সংস্কার কোন ক্রমেই মন হইতে শীঘ্র দূর হয় না, মনুষ্য বালক কালে যে সকল বিষয় শিক্ষা করে, এবং যে সকল উপদেশ প্রাপ্ত হয়, তাহা মনোমধ্যে এমন বদ্ধমূল হইয়া বসে, যে প্রাপ্ত-বয়সে তাহা সহস্র প্রকার উপায়দ্বারাও উন্মূলিত করা সহজ হয় না। অতএব বাল্যাবস্থায় মনুষ্যকে অপরাপর জ্ঞানশিক্ষা প্রদান করিবার সময়, অল্পে অল্পে ধর্ম্মোপদেশ করা যে নিতান্ত কর্ত্তব্য, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। জ্ঞান-শিক্ষার সঙ্গে বালকগণকে ক্রমে ক্রমে ধর্ম্মশিক্ষা প্রদান করিলে যে কি পর্য্যন্ত উপকার দর্শে, তাহা বর্ণনের অতীত।

ইহা যথার্থ বটে যে, প্রথমাবস্থায় বালকগণ ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব সকল সুচারুরূপে বোধগম্য করিতে পারে না, কিন্তু অল্পবয়স্ক যুবাদিগকে বিহিত বিধানে ধর্ম্মোপদেশ করিলে তাহা কদাপি বিফল হয় না।

শিক্ষাবস্থায় বালকের মনে অন্যান্য জ্ঞানের বীজ যেমন অল্পে অল্পে বপন করিতে হয়, ধর্ম্ম-বীজও সেইরূপ ক্রমেতে বপন করিলে তাহা অবশ্যই অঙ্কুরিত হয়, কি জ্ঞান, কি ধর্ম্ম, এক কালে কোন বিষয়েরই শিখর দেশে আরোহণ করিতে পারা যায় না। সকলেরই সোপান আছে, যত্ন পূর্ব্বক তাহা অবলম্বন না করিলে মনুষ্য কখনই কোন বিষয়ের চূড়ারূঢ় হইতে সমর্থ হয় না। আচার্য্য যদি শিষ্যকে এককালে ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব সকল উপদেশ না করিয়া ক্রমে ক্রমে তাহার মনে ধর্ম্মের ভাব প্রবিষ্ট করেন, তাহা হইলে শিষ্য কখন তাহা গ্রহণ ও ধারণ করিতে অক্ষম হয় না। শক্তির অতীত হইলেই তাহা লোকের অসাধ্য হয়। বালক যদি স্বীয় ধীশক্তির পরিমাণানুযায়ী ধর্ম্মোপদেশ প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে অবশ্যই তাহা অধিকার করিতে পারে। ধর্ম্ম যখন শিক্ষণীয় বিষয়, তখন যে উহার আরম্ভের স্থল নাই, এমন কখনই হইতে পারে না। অতএব ঐ আরম্ভ স্থলে ধর্ম্মশিক্ষার সূত্রপাত করিলে অবশ্যই তাহা সুসিদ্ধ হইয়া উঠে। কেবল ধর্ম্ম কেন, বিহিত বিধানে শিক্ষা প্রদান করিতে না পারিলে কোন বিষয়ই সফল হয় না। শিক্ষার দোষেই অনেক সময়, অনেক স্থলে ধর্ম্মপদেশ বিফল হয়। ধর্ম্ম অতি মধুর পদার্থ, কিন্তু কেবল ধর্ম্মের নাম শ্রবণে লোকে কখন ধর্ম্মের মর্ম্ম অবগত হইতে পারে না। কোন

ব্যক্তিকে উহার তাৎপর্য্যাবগত করাইতে হইলে বিশেষ করিয়া উহার পরিচয় দেওয়া উচিত। জগদীশ্বরকে ভক্তি করা উচিত, পিতা মাতাকে শ্রদ্ধা করা কর্ত্তব্য, ও সর্ব্বদা ন্যায়, সত্য অবলম্বন করিয়া কার্য্য করা বিধেয়, ইত্যাদি স্থলে উপদেশ দ্বারা বালকের যদিও না ধর্ম্মে মতি হয়, কিন্তু তাহার ধীশক্তি অনুযায়ী প্রীতি ও ভক্তি উৎপাদক ঈশ্বরের গুণ কীর্ত্তন, পিতামাতার স্নেহ-বর্দ্ধন ও ন্যায় সত্যের গুণ ব্যাখ্যা করিলে অবশ্যই ধর্ম্মেতে আস্থা হয়। যে ব্যক্তি সহস্রবার ঈশ্বরের নাম শ্রবণ করিলে তাহাতে ভক্তি করিতে রত হয় না, সেই ব্যক্তির নিকট এক বার বিশেষ করিয়া পরমেশ্বরের মহিমা কীর্ত্তন করা যায়, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তাহার মনে ভক্তি রসের সঞ্চার হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই। অতএব শিক্ষকগণকে সর্ব্বদা এইরূপ সাবধান হইয়া ধর্ম্মোপদেশ করা উচিত যে উপদিষ্ট ব্যক্তি তাহার উপদেশ বোধগম্য করিতে পারিয়া তাহার ফললাভে অধিকারী হইতে সমর্থ হয়।

প্রথমকালে জ্ঞানশিক্ষার সময় বালকগণকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করা যে নিতান্ত কর্ত্তব্য, তাহা বহুবিধ যুক্তি ও বিবিধ প্রকার প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে। শিক্ষার তারতম্যে যে মনুষ্যের ধর্ম্মজ্ঞানের কতদূর পর্য্যন্ত ইতর বিশেষ হয়, বিচক্ষণ ব্যক্তি কিঞ্চিৎ বিবেচনা করিলেই অনায়াসে বোধগম্য করিতে পারেন।

পরম ন্যায়বান্ পরমেশ্বর মনুষ্য মাত্রেরই মনোভূমিতে ধর্ম্মের বীজ বপন করিয়াছেন, যে ব্যক্তি যে পরিমাণে আপনার মনোভূমিকে কর্ষিত করিতে পারে, তাহার অন্তরস্থিত ধর্ম্মাঙ্কুর সেই পরিমাণে বর্দ্ধিত হয়। যেমন ইতর ক্ষেত্রে কোন বৃক্ষের বীজ বপন করিয়া তাহাতে বারিসেচন ও যত্নসাধন না করিলে তাহা অঙ্কুরিত হয় না, এবং অযত্নে কচিৎ অঙ্কুরিত হইলেও সে অঙ্কুর যথাসম্ভব তেজঃ প্রাপ্ত না হইয়া সুন্দর রূপে বর্দ্ধিত ও ফলমুখ হয় না, কিয়ৎকাল নিস্তেজাবস্থায় অবস্থান করিয়া ক্রমে শীর্ণ ও শুষ্ক হইয়া যায়। সেইরূপ মনুষ্যের অন্তরস্থিত ধর্ম্মবীজেও শিক্ষাবারি সেচন না করিলে তাহা সুন্দর রূপে অঙ্কুরিত হয় না, এবং কথঞ্চিৎ অঙ্কুরিত হইলেও তাহা উপযুক্ত তেজঃ প্রাপ্ত না হইয়া ফলশালী হয় না। অযত্ন ও অশিক্ষা হেতু সেই ধর্ম্মাঙ্কুর অতি মলিন ভাবে কাল যাপন করে, বা দিনে দিনে শুষ্ক হইয়া যায়। অতএব জগদীশ্বর-প্রদত্ত ধর্ম্মবীজকে অঙ্কুরিত ও বর্দ্ধিত করিবার জন্য তাহাতে বিহিত বিধানে শিক্ষা বারিসেচন করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। তাহা না করিলে কোন ক্রমেই মনুষ্য সম্পূর্ণ রূপে ধর্ম্ম-ফল লাভে অধিকারী হইতে পারে না। পুরাবৃত্ত পাঠ করিলে বিলক্ষণ প্রতীতি হয়, যে কালে কালে পৃথিবী মধ্যে যখন যে পরিমাণে ধর্ম্ম

শিক্ষার বিস্তার হইয়াছে, তৎকালীন লোকে সেই পরিমাণেই সেই ধর্ম্ম-তত্ত্ব লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে। এবং যে দেশীয় লোকে ধর্ম্ম শিক্ষার প্রতি যে প্রকার মনোযোগ করিয়াছে, তাহারা তদনুরূপ ধর্ম্মাধিকার প্রাপ্ত হইয়াছে।

প্রথমাবস্থায় শিক্ষার সময় বালকগণকে ধর্ম্ম শিক্ষা প্রদান না করিলে যে বিষম ভয়ঙ্কর অনিষ্ট উদ্ভাবিত হওয়া সম্ভব, তাহা আমাদিগের এদেশেও সুস্পষ্ট প্রকাশ রহিয়াছে। পূর্ব্বাপেক্ষা এক্ষণে এদেশে যে বালক-শিক্ষার প্রণালী অনেক উৎকৃষ্ট হইয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু পিতা মাতা ও শিক্ষকগণ বালকের বিদ্যা-শিক্ষার প্রতি যাদৃশ মনোযোগ করেন, ধর্ম্মশিক্ষা বিষয়ে তাদৃশ মনোযোগী হয়েন না বলিয়া অদ্যাপি শিক্ষা-প্রণালী সম্পূর্ণরূপে দোষ-শূন্য হয় নাই। এক্ষণেও শিক্ষা-প্রণালী বিলক্ষণ দোষাশ্রিত রহিয়াছে। এদেশীয় বালকগণকে জ্ঞানশিক্ষার সময় ধর্ম্মশিক্ষা প্রদান না করাতে যে সকল গুরুতর অনিষ্ট উদ্ভব হইতেছে, বিচক্ষণ ব্যক্তি কিঞ্চিৎকাল মনোনিবেশ করিলেই তাহা অনায়াসে অবগত হইতে পারেন। মানবজাতি ধর্ম্মবিহীন হইলে যে সংসারের কি পর্য্যন্ত অকল্যাণ জন্মিতে পারে, তাহা বর্ণন করিয়া শেষ করা যায় না। অবোধ-পশু অপেক্ষা অধার্ম্মিক মনুষ্য অধিক ভয়ঙ্কর। কিন্তু

এদেশে ধর্ম্ম-শিক্ষার প্রতি যে প্রকার অমনোযোগ দৃষ্ট হইতেছে, ইহা ক্রমে বৃদ্ধি বা স্থায়ী হইলে পরিণামে এখান হইতে ধর্ম্ম-তত্ত্ব বিলুপ্ত হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। শিক্ষা ও উপদেশাভাবে বিদ্যালয়স্থ অনেক ছাত্র ও সুশিক্ষিত নব্য সম্প্রদায়ীদিগের মধ্যে অনেকের মনে ধর্ম্মের মূর্ত্তি ক্রমে ছায়ার ন্যায় হইয়া যাইতেছে, এবং যে পরিমাণে ধর্ম্মের তেজঃ ম্লান হইতেছে, সেই পরিমাণে অধর্ম্মের প্রভাও বৃদ্ধি হইতেছে। আমরা যদিও বর্ত্তমান শিষ্ট-সম্প্রদায়-গণিত লোকদিগের ধর্ম্মানুষ্ঠান বিশেষরূপে অনুসন্ধান করিয়া দেখি, তাহা হইলেই উহার বিশেষ প্রমাণ প্রাপ্ত হই। ইহা কি আক্ষেপের বিষয়, যে বিদ্যালয় ও পাঠমন্দির সকল বালকদিগের স্বভাব-শোধন ও গৌরব-বর্দ্ধনের নিদানভূত, ধর্ম্মশিক্ষার অভাবে সেই সকল বিদ্যালয় ও পাঠশালা তাহাদিগের অধঃপতনের কারণ হয়। আমরা দেখিতেছি যে ছাত্রগণ যেমন কোন বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইয়া, বিদ্যাশিক্ষা করিতে আরম্ভ করে, অমনি কুসংসর্গে লিপ্ত হইয়া ক্রমে অধর্ম্ম অভ্যাস করিতেও প্রবৃত্ত হয়। যে সকল পাপাচরণ দ্বারা মনুষ্যকুল একেবারে অধঃপতন প্রাপ্ত হয়, এবং যে সকল অধর্ম্ম ও অপকর্ম্ম জন্য সংসারের উচ্ছেদ-দশা উৎপন্ন হইবার নিতান্ত সম্ভব, ধর্ম্মোপদেশাভাবে ছাত্রগণ বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইয়া

প্রায় তৎসমুদায়েরই দৃষ্টাবলোকন করে. এবং ক্রমে অনুকরণ করিতে প্রবৃত্ত হয়। আমরা যদি একে একে এদেশীয় সমুদয় বিদ্যালয়ের স্বভাব ও চরিত্র অনুসন্ধান করিয়া দেখি তাহা হইলে প্রায় অধিকাংশ বালককেই অধর্ম্মপঙ্কে লিপ্ত দেখিতে পাই। বিদ্যালয়স্থ ছাত্রেরা যে সকল অধর্ম্ম অভ্যাস করে, তাহা কোন মতেই উল্লেখের যোগ্য নহে, তৎসমুদয় স্মরণ করিলে হৃদয়ে বেদনা-বোধ ও নিদারুণ লজ্জার উদয় হয়। হায়! ইহা কি সামান্য আক্ষেপের বিষয়! যে বিদ্যালয় ধর্ম্মোন্নতির একমাত্র প্রধানস্থল, কেবল এক শিক্ষার অভাবে সেই বিদ্যা মন্দিরেতেই বালকদিগের মনে গুরুতর অধর্ম্মের সূত্রপাত হয়। শিক্ষকগণ বালকদিগের জ্ঞান শিক্ষা বিষয়ে যে প্রকার মনঃসংযোগ করেন, যদি তাঁহাদিগের ধর্ম্মশিক্ষার জন্য তদনুরূপ দৃষ্টি রাখেন, তবে ছাত্রগণ কখনই স্বেচ্ছাচারী হইয়া উক্ত প্রকারে আপনাদিগের স্বভাবকে মলিন করিতে সমর্থ হয় না। কেবল শিক্ষার ত্রুটি ও শিক্ষকের অনবধান জন্য বালকগণ নানা প্রকার অধর্ম্মপঙ্কে লিপ্ত হয়। যদি এতদ্দেশীয় প্রত্যেক বিদ্যালয়ের প্রাত্যহিক বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা হইলে দৃষ্ট হয় যে প্রতিদিন এক একটা বিদ্যালয়ে নানা প্রকার বিগর্হিত কর্ম্ম সকল অনুষ্ঠিত হয়, এবং প্রতি বিদ্যালয়ের শিক্ষকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেও তাঁহারা

প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু ধর্ম্মশিক্ষার দ্বারা ঐ সমস্ত অত্যাচারের যথা সম্ভব উপায় নির্দ্ধারিত হয় না বলিয়া উহা ক্রমে বৃদ্ধিই হইতে থাকে। বিহিত বিধানে উপদেশ না পাওয়াতে দিন দিন বালকদিগের ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি নিস্তেজ হইতে থাকে, এবং তাহাদিগের এইরূপ সংস্কার জন্মে, যে আমরা অসত্য কথাই ব্যবহার করি, আর চৌর্য্য বৃত্তি ও অন্যায় আচার, নিষ্ঠুরতা প্রভৃতি অন্য কোন কুকার্য্যই অনুষ্ঠান করি, তাহাতে আমাদিগের কোন হানি নাই, আমরা ভূগোল, জ্যোতিষ, পুরাবৃত্ত, গণিত শাস্ত্র ও পদার্থ বিদ্যাদি অভ্যাস করিয়া বুদ্ধি বৃত্তিকে মার্জ্জিত করিতে পারিলেই লোক-সমাজে প্রতিষ্ঠা-ভাজন ও মহত্ত্বের আস্পদে অধিরূঢ় হইতে পারিব। এইরূপে ছাত্রগণ ধর্ম্মানুষ্ঠানে অব-হেলা করিয়া কেবল অঙ্কশাস্ত্র, পদার্থবিদ্যা প্রভৃতি কতিপয় নির্দ্দিষ্ট পুস্তকের প্রতি মনোভিনিবেশ ক-রিয়া কালক্ষেপ করে, এবং তদনুরূপ গ্রন্থাদিকেই শিক্ষণীয় ও অনুষ্ঠেয় বলিয়া জানে। সুতরাং তাহা-দিগের অন্তর্বস্থিত ধর্ম্মস্রোত দিনে দিনে রুদ্ধ হইয়া যায়, তাহাদিগের নিকৃষ্ট বৃত্তি সমুদয় কোন কারণে উত্তেজিত হইলে তাহা নিবারণ করিবার আর উপায় থাকে না, এবং ঐ পঠদ্দশাতেই অধর্ম্মাভ্যাস বিলক্ষণ দৃঢীভূত হইয়া যায়।

পাঠাবস্থায় প্রথমতঃ বিদ্যালয়েই যে সকল ছাত্রেরা

এইরূপে ধর্ম্মজ্ঞান বিবর্জ্জিত হয়, তাহারা বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া সংসারে প্রবেশ করিলে তাহাদিগের দ্বারা যে সকল অত্যাচারের সম্ভাবনা, বিজ্ঞ লোকে তাহা অনায়াসেই বোধগম্য করিতে পারেন। তাহাদিগের মনে কোন প্রকার নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি প্রবলা হইলে তাহারা তদনুগামী হইয়াই কার্য্য করিতে উদ্যত হয়, তাহারা কেবল লৌকিক রক্ষা করিয়াই জীবন-যাত্রা সমাধান করিতে চেষ্টা পায়। তাহাদিগের মনে কিছুমাত্র ধর্ম্ম-ভয় থাকে না। যাহার মনে ধর্ম্মভয়ের লেশমাত্র না থাকে, সে যে কি ভয়ঙ্কর জন্তু, তাহা লিখিয়া শেষ করা যায় না। কি নিকৃষ্ট বৃত্তি, কি উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম প্রবৃত্তি, মনুষ্য-মনে যখন যে কোন বৃত্তি উত্তেজিত হয়, তখনই তাহার সেই বৃত্তি চরিতার্থ করিতে ইচ্ছা হয়, কিন্তু কোন কারণে ধার্ম্মিক লোকের কোন নিকৃষ্ট বৃত্তি চরিতার্থের ইচ্ছা হইলে, তিনি প্রবলাধর্ম্ম-প্রবৃত্তির দ্বারা সেই ইচ্ছার নিবারণ করিয়া আপনাকে অধর্ম্মপঙ্ক হইতে দূরে রাখেন। আর অধার্ম্মিক লোকে, তৎক্ষণাৎ সেই ইচ্ছার অনুগামী হইয়া তাহা চরিতার্থ করতঃ আপনাকে পাপকূপে নিক্ষেপ করে। অতএব বাল্যাবস্থা হইতে যাহার মন ধর্ম্মশাসনে অনুশাসিত না হয়, এবং ধর্ম্মাচরণ অভ্যাস না করে, সে হয়তো অনায়াসেই প্রবৃত্তি বিশেষের অনুগত হইয়া চিরজীবন অধর্ম্ম-স্রোতে ভাসমান হয়। সে ব্যক্তি কেবল লোকভয়ে

প্রকাশ্যে কোন নিন্দনীয় কর্ম্মসাধন করিতে সাহসী হয় না, এবং লৌকিক প্রতিষ্ঠা হইতে পরিত্যক্ত হইবার আশঙ্কায় ব্যক্তরূপে কুকর্ম্ম করে না। সে কেবল লৌকিক নিন্দা প্রতিষ্ঠার প্রতি কর্ণপাত করিয়াই কালযাপন করে, ধর্ম্মের দিকে একবারও দৃষ্টিপাত করে না। সে ব্যক্তি গোপনে বেশ্যা-মন্দিরে মদিরা পানে সমস্ত যামিনী যাপন করিয়া পুনর্ব্বার দিবাভাগে প্রকাশ্যে প্রতিষ্ঠা-ভাজন হইতে আইসে এবং সুযোগ পাইলে ছলে, বা কৌশলে, লোকের ধনশোষণ, সর্ব্বস্ব হরণ পর্য্যন্ত করিয়া আপনার লোভাদি বৃত্তিকে চরিতার্থ করিতে পারে। বস্তুতঃ কোন কুকর্ম্মই তাহার অকর্ত্তব্য থাকে না, তবে যদি কিছুদিন লোকভয়ে বিরত থাকে। কিন্তু ধর্ম্মভয় বিহীন মনুষ্যের লোকভয়ই বা কত দিন স্থায়ী হয় এবং সে লৌকিক ভয়ই তাহাকে কত দূর পর্য্যন্ত অধর্ম্ম হইতে দূরে রাখিতে পারে? তাহার দুষ্ট ইচ্ছা সকল পুনঃপুনঃ চরিতার্থ হইয়া ক্রমে যত বৃদ্ধি পায়, ততই তাহার লৌকিক ভয় হ্রাস হইতে থাকে, এবং সে, লোকের অসাক্ষাতে সকল প্রকার কুক্রিয়াই করিতে পারে।

পরিণামে সে প্রসিদ্ধ পাপাচারী হইয়া উঠে। ইন্দ্রিয়-চরিতার্থ করাই তাহার সর্ব্বাঙ্গসাধন বোধ হয়। এবং ঐহিক সামান্য সুখলাভই তাহার স্বর্গভোগ তুল্য জ্ঞান হইতে থাকে। যে প্রকার দুশ্চরিত্র ঘটনের

বিষয় লিখিত হইল, এদেশীয় অধুনাতন বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে কর্ম্মশিক্ষা প্রদান করিবার পদ্ধতি না থাকাতে তাহাদিগের মধ্যে অনেকেরই সেই প্রকার চরিত্র ঘটিয়া উঠিতেছে, এবং অবিলম্বে ধর্ম্মশিক্ষার কোন উপায় বিধান না করিলে ক্রমে সকলেরই ঐ প্রকার মন্দ স্বভাব সঙ্ঘটন হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা দৃষ্ট হইতেছে। এখনকার বিদ্যাভিমানী নব্য সম্প্রদায়ীদিগের মধ্যে প্রায় অধিকাংশেরই ধর্ম্মেতে অনাস্থা ও ধর্ম্মেতে দৃঢ়তর শৈথিল্যভাব দেখা যায়, ধর্ম্ম-শিক্ষার উপায় অভাবই তাহার এক মাত্র কারণ বলিয়া অনুভব হইতেছে। যাহা হউক দেশের সুশিক্ষিত সম্প্রদায়ের ধর্ম্মের প্রতি এ প্রকার অনাদর হওয়া মহান্ অনর্থের কারণ সন্দেহ নাই। এতাদৃশ বিষবৃক্ষ হইতে যে কি প্রকার গরলময় ফল উৎপন্ন হওয়া সম্ভব, তাহা বর্ণন করিতে শঙ্কা হয়। যদি দেশের সুশিক্ষিত মণ্ডলীতেই ধর্ম্মের আদর না থাকে, তবে এ দেশে ধর্ম্মতত্ত্ব রক্ষা পাইবার আর কি সম্ভব! তাহা হইলে সকল লোক ক্রমে ক্রমে ধর্ম্মচ্যুত হইতে থাকিবে। সংসার মধ্যে সকল লোকে সমান অবস্থা প্রাপ্ত হয় না, সুতরাং সকল লোক সমভাবে জ্ঞান-ধর্ম্মাদির শিক্ষাও পায় না, কেহ গুরুমুখে উপদেশ শ্রবণ, ও গ্রন্থাদি পাঠ করিয়া জ্ঞান-ধর্ম্মাদি প্রাপ্ত হয়, এবং কেহ কেহ সুশিক্ষিতদিগের দৃষ্টান্ত দর্শন

করিয়া জ্ঞানধর্ম্মের মর্ম্মলাভ করে। মনুষ্যের এইরূপ প্রকৃতি দৃষ্ট হয়, যে, সুশিক্ষিত ও শিষ্ট সম্প্রদায়ীরা যে কার্য্য অনুষ্ঠানও যে প্রকার ব্যবহার অবলম্বন করেন; সাধারণ লোকে বিনা উপদেশে প্রায় তাহার অনুকরণ করিয়া থাকে। অতএব যদি এ দেশীয় শিষ্ট-সমাজে ধর্ম্মচর্চ্চার শৈথিল্য হয়, তবে সাধারণ লোকেও অবশ্য তাহার অনুগামী হইয়া ক্রমে ধর্ম্মেতে অনাদর করিবে, ইহাতে সন্দেহ কি? যদি অশিক্ষিত সাধারণ লোকে দেখে, যে উত্তম বিদ্যাবান্ ও বিলক্ষণ বুদ্ধিমান্ লোকে অনায়াসে, বেশ্যাগমন, মিথ্যাকথন ও অপ-হরণাদি সকল প্রকার কুকর্ম্ম করিয়া ক্ষুব্ধ হইতেছে না, এবং কোন রূপে শঙ্কাপ্রাপ্ত হইতেছে না, তবে তাহারাও উক্ত প্রকার অধর্ম্মাচরণ করিতে কিছুমাত্র শঙ্কিত হইবে না, সকল প্রকার কুকর্ম্মই সাধন করিবে। এবং পরস্পর সকলে কুকর্ম্মী হইলে ক্রমে ক্রমে এখান হইতে লোকভয়ও বিলুপ্ত হইবে। যদি দেশব্যাপী যাবতীয় লোকেই এ প্রকার অধর্ম্মে লিপ্ত হয়, তবে সে অধর্ম্ম অনুষ্ঠান করিতে আর কেহ লৌকিক অপ-শঙ্কায় শঙ্কিত হয় না, সুতরাং এদেশের যাবতীয় লোকে পাপাচরণে রত হইলে এদেশ মধ্যেও অধর্ম্মানুষ্ঠান পক্ষে কিছুমাত্র লোকভয় থাকিবেক না, পাপের পথ একেবারে পরিষ্কৃত হইয়া উঠিবে। অতএব সুশিক্ষিত শিষ্ট সমাজে কুক্রিয়া প্রচার হইলে তাহা ঘোরতর

অনর্থের কারণ হয়। ধর্ম্মশিক্ষা প্রাপ্ত না হইয়া এদেশীয় লোকে ক্রমাগত কুকর্ম্মশালী হইলে তাহাদিগের বংশ পরম্পরাও অধর্ম্মস্রোতে ভাসমান হওয়া নিতান্ত সম্ভব। যদি পিতা ভ্রাতাদি গুরু জন কস্মিন্ কালে বালকগণকে ধর্ম্মশিক্ষা প্রদান না করে, এবং আপনারাও ধর্ম্মশাসন অবলম্বন, সৎকর্ম্মে আস্থ, ও অসৎ কর্ম্মে অনাদর না করে, তাহা হইলে ঐ বালকগণই বা আর কি উপায়ে সৎপথে উপনীত হইতে পারে, তাহারা স্ব স্ব গুরুজনের অনুকরণ করিয়া ক্রমে পাপপঙ্কেই মগ্ন হয়, অতএব এদেশ মধ্যে ধর্ম্মশিক্ষার পদ্ধতি প্রচলিত না থাকাতে চিরকালের জন্য এদেশের অধঃপতন হইতেছে, পরিণামে কোন কালে যে ইহার কোন কল্যাণ উদ্ভব হইবে, তাহারও পথ রুদ্ধ হইতেছে। যদি দেশের দুরবস্থা দূর করিবার জন্য অর্থ সামর্থ্যাদি নানা উপায় দ্বারা চেষ্টা করা আবশ্যক হয়, এবং যদি প্রজার কল্যাণ বর্দ্ধনের জন্যও লোক-সমাজে অত্যাচার নিবারণ হেতু রাজনিয়ম ও রাজদণ্ডাদি বিধান করা শ্রেয়স্কর হয়, তবে এদেশের চির অকল্যাণ নিবারণ নিমিত্ত অবিলম্বেই বালকগণকে জ্ঞানশিক্ষার সহিত ধর্ম্মশিক্ষা প্রদান করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

ধর্ম্ম-বিষয়ক শিক্ষা-প্রদানের নানা প্রকার পথ আছে। তন্মধ্যে বাক্য দ্বারা সদুপদেশ প্রদান, কার্য্য

দ্বারা সদ্দৃষ্টান্ত প্রদর্শন, বালকগণকে সৎসংসর্গে সংস্থাপন ও তাহাদিগের উৎকৃষ্ট বৃত্তির পরিচালন, ও নিকৃষ্ট বৃত্তির নিরোধ করণ ইত্যাদি কতিপয় উপায় অবলম্বন করিলেই, তাহাদিগকে এক প্রকার ধর্ম্মশিক্ষা প্রদান করা সুসাধ্য হয়।

১।—প্রথমতঃ বাক্যদ্বারা উপদেশ করণ। বালকগণের স্বীয় স্বীয় ধারণাশক্তি অনুসারে তাহাদিগকে ধর্ম্মতত্ত্বের উপদেশ করা কর্ত্তব্য। পিতামাতা বা শিক্ষক, যে সময় কোন বালককে ধর্ম্মতত্ত্বের উপদেশ দেন, তৎকালে তাহাদিগের ইহা বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত, যে তাহাদিগের উপদেশ বাক্য সকল সম্যক্ রূপে বালকের হৃদয়ঙ্গম হইতেছে কি না? যে সকল ধর্ম্মোপদেশ বালকগণ বোধগম্য করিতে সমর্থ না হয়, তদ্দ্বারা তাহাদিগের কিছুমাত্র উপকার দর্শিবার সম্ভাবনা নাই। ক্ষুদ্র শিশুকে কঠিন শব্দ ও অস্পষ্ট ভাবে উপদেশ করিলে কেবল উপদেষ্টার পরিশ্রম বিফল হয়। যে সকল ধর্ম্মোপদেশ শিশুদিগের মনেতে সন্নিবিষ্ট হয়, তাহা কদাপি নিরর্থক হয় না। যদিও সর্ব্বদা ঐ সকল উপদেশের আশু ফল দেখা যায় না, কিন্তু তদ্রূপ উপদেশ কোন না কোন কালে অবশ্যই স্বীয় ক্রম প্রকাশ করে। যেমন কোন কোন শস্যের বীজ দীর্ঘকাল প্রচ্ছন্ন থাকিয়া, এক সময় অঙ্কুরিত হয়, সেইরূপ কোন কোন ধর্ম্মোপদেশ বালকগণের মনোমধ্যে

নিহিত থাকিয়া দীর্ঘ কালের পর স্বকীয় ফলোৎপাদন করে। শিক্ষার সময় বালকগণ যে সকল উপদেশ বাক্যের প্রতি নিতান্ত অবহেলা করে, হয়ত সে সকল কথা এক সময় তাহাদিগের স্মরণারূঢ় হইয়া তাহাদিগকে গুরুতর অধর্ম্ম হইতে রক্ষা করিতে পারে। অতএব সর্ব্বদা সত্বরে ধর্ম্মোপদেশের ফল প্রত্যক্ষ না হইলেও বালকগণের অবস্থানুযায়ী উপদেশ করিতে অবহেলা করা কর্ত্তব্য নহে। কোন প্রকার উপলক্ষ্য পাইলেই শিশুগণকে নীতি শিক্ষা প্রদান করা বিধেয়। বালকগণকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিবার সময় সংক্ষেপে নীতিসার ব্যবহার না করিয়া তাহার মর্ম্ম বিস্তার ক্রমে পরিষ্কার করিয়া, ব্যাখ্যা করিলে বিশেষ উপকার দর্শে। অল্পবয়স্ক শিশুগণকে কথাচ্ছলে কোন উপদেশ প্রদান করিলে সে উপদেশ তাহাদিগের যেমন সুন্দররূপে হৃদয়ঙ্গম হয়, মর্ম্মোদ্ধৃত সংক্ষিপ্ত বাক্য সকল তদ্রূপ হয় না। বালকগণ ইতিহাস প্রসঙ্গে যে সকল উপদেশ শ্রবণ করে, তৎসমুদয় তাহাদিগের মনেতে বদ্ধমূল হইয়া বসে, এবং তাহার দোষ গুণ অনায়াসে তাহারা বিচার করিতে পারে। কোন বালক কোন অপরাধ করিলে, তজ্জন্য তাহাকে কটু ও কর্কশ বাক্যে ভৎর্সনা না করিয়া মিষ্ট বাক্যের দ্বারা সান্ত্বনা করা উচিত; এবং তাহাকে স্বয়ং সেই দোষের বিচার করিতে ভার দেওয়া কর্ত্তব্য। কি

বালক, কি যুবা, কি বৃদ্ধ, সকল মনুষ্যেরই এই প্রকৃতি যে যখন পরমুখে কোন প্রকার স্বীয় দোষ শ্রবণ করে, তখন তাহাদিগের সেই দোষ পরিহারের ইচ্ছা না হইয়া বরং মনেতে অন্যান্য ভাবের উদয় হয়। অপরাধী ব্যক্তিকে দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করিলে অবশ্যই তাহার ক্রোধের উদয় হয়, এবং মনুষ্য যখন রাগান্ধ হয়, তখন কোন রূপেই সত্যাসত্য ও দোষগুণ স্থির করিতে পারে না। তাহাকে যদি স্বয়ং সেই দোষের বিচার করিতে ভারার্পণ করা যায়, তাহা হইলে সে ব্যক্তি রোষযুক্ত না হইয়া প্রশান্তমনে আপন দোষ বুঝিতে পারে, এবং তজ্জন্য সাপরাধ হইয়া মনে মনে শোচনা করে। মনুষ্য যে দোষ আপনাতে অতিশয় লঘু দেখে, অন্যের পক্ষে তাহাকে গুরুতর রূপে দেখিতে পায়। অতএব ছাত্র বা পুত্র অপরাধী হইলে সেই অপরাধ অন্য ব্যক্তিতে আরোপ করিয়া তাহাকে বিচার করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য, তাহা হইলে সহজেই সে আপন অপরাধের সম্যক্ ভাব বুঝিতে পারে, এবং তাহা হইতে সম্যক্ রূপে নিবৃত্ত থাকিতেও চেষ্টা পায়। যখন কোন মনুষ্যকৃত অপরাধ স্বয়ং বিচার করিতে প্রবৃত্ত হয়, তখন তাহার ক্রোধাদি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সকল উত্তেজিত না হইয়া, ন্যায় ও বিচার প্রভৃতি সৎপ্রবৃত্তি সকলই জাগ্রত হয়। সুতরাং তদ্দ্বারা তাহাকে অনায়াসে স্বকৃত অপরাধে প্রবুদ্ধ করিতে পারা যায়, এবং

তদ্দ্বারা তাহাকে অনায়াসেই কুকর্ম্ম হইতে নিবৃত্তি করিয়া সৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত করান যায়। ছাত্র বা পুত্রাদির অপরাধ সন্দর্শন করিলে ক্রোধ পরবশ হইয়া এক এক সময় দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করিতে হয় বটে, কিন্তু অপরাধী পুত্র বা ছাত্রকে কটুবাক্য দ্বারা তাড়না না করিয়া মিষ্টকথায় উপদেশ করার যে কত গুণ, তাহা লিখিয়া শেষ করা অসাধ্য। কটু বাক্য দ্বারা যে বালককে কোন মতেই কুকর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত ও সৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত করিতে পারা যায় না, প্রশান্ত বচন দ্বারা উপদেশ করিয়া তাহাকে অতি সহজেই ধর্ম্মপথের পথিক করিতে পারা যায়। যাহাতে ধর্ম্মের প্রতি বালকগণের বিশেষ অনুরাগ জন্মে, অবকাশানুসারে তাহা বিশেষ করিয়া ব্যাখ্যা করা কর্ত্তব্য। প্রতিদিন যেমন নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে বালকদিগকে জ্ঞানশিক্ষা প্রদান না করিলে তাহারা কোন ক্রমেই কৃতবিদ্য হইতে পারে না সেই রূপ প্রত্যহ কোন সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া যথানিয়মে শিশু সন্তানকে উপদেশ প্রদান না করিলেও সে কোন ক্রমে ধর্ম্মতত্ত্ব লাভ করিতে সমর্থ হয় না। প্রতিদিন বালকগণকে কোন নির্দ্দিষ্ট কালে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করা আবশ্যক। নিয়মিত উপদেশ বাক্যের প্রতি বালকগণের যে প্রকার শ্রদ্ধা জন্মে, সামান্য বাক্যের প্রতি কখনই সে রূপ জন্মে না। অনেক স্থানেই জ্ঞান ধর্ম্মের অনেক প্রকার প্রসঙ্গ

হইয়া থাকে, এবং অনেক সময় অনেকেরই তাহার প্রতি শ্রুতিপাত হয়, কিন্তু শ্রদ্ধা পূর্ব্বক যে ব্যক্তি সেই বাক্যের প্রতি মনোযোগ করে, এবং যত্ন পূর্ব্বক তাহাকে হৃদয়ে ধারণ করে, সেই তাহার ফললাভের অধিকারী হয়। নির্মিত উপদেশ দ্বারা বালকগণ যে সকল কথা শ্রবণ করে, তাহাতেই তাহাদিগের বিশেষ উপকার দর্শিবার সম্ভাবনা। বালকগণকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিবার সময় "ধর্ম্ম পালন করিলে কল্যাণ হয়, এবং অধর্ম্মসেবা করিলে অমঙ্গল ঘটে" ঈদৃশ সঙ্ক্ষেপ বাক্য প্রয়োগ না করিয়া যে প্রকার ধর্ম্ম পালন করিয়া যাদৃশ সুখ সংঘটন হইতে পারে, এবং যদ্রূপ অধর্ম্ম কর্ম্মদ্বারা যে প্রকার অশুভোৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা, তাহা বিশেষ করিয়া ব্যাখ্যা করিলে শিশু সন্তানগণের সেই উপদেশের প্রতি স্বতঃই মনের আদর জন্মে। এবং তাহারা অবশ্যই তদনুযায়ী কার্য্য করিতে চেষ্টা করে. যে প্রকার ধর্ম্ম কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিয়া যে সকল লোক যে প্রকার সুখ ভোগ করিতেছে, এবং যেরূপ সংসারের কল্যাণ সাধন করিয়াছে ও অধার্ম্মিক লোক ধর্ম্মপথ পরিত্যাগ করিয়া আপনার ও পৃথিবীর যাদৃশ অশুভ উৎপাদন করিয়াছে, উপদিষ্ট ছাত্র বা পুত্রদিগকে বিশেষ করিয়া তৎসমুদায়ের নিদর্শন প্রদর্শন করিলে তাহারা সুস্পষ্ট রূপে ধর্ম্মাধর্ম্মের তাৎপর্য্যাবধারণ করিতে পারে, এবং ইচ্ছা পূর্ব্বক ধর্ম্মের শরণাপন্ন হইতে রত হয়।

সুন্দর বস্তুর প্রতি স্বতঃ প্রীতি হওয়া মনুষ্যের যেমন স্বভাব সিদ্ধ, সদ্বিষয়ে শ্রদ্ধার উদয় হওয়াও তাদৃশ প্রকৃতি-মূলক। উপদেশকগণ যদি সমুচিত বাক্য দ্বারা স্ব স্ব উপদেশ্যদিগের মনে ধর্ম্মের মহত্ত্ব প্রতিভাত করিয়া দিতে পারেন, তাহা হইলে অনায়াসেই তাহারা ধর্ম্মেতে শ্রদ্ধা করিতে উদ্যত হয়।

পুত্র অথবা ছাত্রাদি উপদেশ্যগণকে ঈশ্বর তত্ত্বের উপদেশ করিবার সময় তাহাদের নিকট জগদীশ্বরের জ্ঞানশক্তি ও করুণার বিষয় বিশেষ করিয়া বর্ণনা করা বিধেয়, তাহা হইলে উহাদিগের মনে আপনা হইতেই ঈশ্বরেতে শ্রদ্ধা ভক্তির উদয় হয়, এবং তাহা হইলে উহারা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক জগদীশ্বরের প্রেমমাধুরী ভোগ করিতে ব্যগ্র হয়।

এ ব্রহ্মাণ্ডের সকল পদার্থই অনাদি পুরুষের অনন্ত মহিমার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে, এবং সকল বস্তুতেই তাঁহার জ্ঞানশক্তি ও করুণার চিহ্ন দেদীপ্যমান প্রকাশিত রহিয়াছে। জ্ঞানবান আচার্য্য মনে করিলে প্রত্যেক কথা-প্রসঙ্গেই স্বীয় শিষ্যকে ঈশ্বর তত্ত্বের উপদেশ করিতে পারেন, এবং উক্ত প্রকার বিহিত উপদেশ দ্বারা উপদিষ্ট ব্যক্তিও ক্রমেক্রমে ঈশ্বরের অপূর্ব্ব তত্ত্বলাভ করিতে সমর্থ হয়। শিশুগণ যে অবস্থায় পিতামাতা ও আচার্য্যের নিকট হইতে অপরাপর বিষয়ের উপদেশ শ্রবণ করে, পিতামাতা ও ভূর্ত

যদি তৎকালে স্বীয় সন্তানদিগকে বিহিত বিধানে ধর্ম্মতত্ত্বের উপদেশ দেন, তাহা হইলে কখনও সে সমস্ত উপদেশ নিষ্ফল হয় না। বালকগণ যখন গুরু-বাক্য দ্বারা অপরাপর যাবতীয় বিষয়ের জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হয়, তখন তাহারা যে বাক্য দ্বারা অবশ্যই ধর্ম্মজ্ঞানও লাভ করিতে পারিবে, তাহা সহজেই প্রতিপন্ন হইতেছে।

২।—দ্বিতীয়তঃ সদ্দৃষ্টান্ত প্রদর্শন। দৃষ্টান্ত প্রদর্শন দ্বারা বালকগণকে যেমন সহজে ধর্ম্মশিক্ষা প্রদান করিতে পারা যায়, অন্য কোন উপায় দ্বারা সেরূপ পারা যায় না। যাঁহারা বিশেষ রূপে মানব-প্রকৃতি আলোচনা করিয়া দেখিয়াছেন, তাঁহারাই বিলক্ষণ জানিয়াছেন, যে কোন ব্যক্তিকে কোন বিষয়ের শিক্ষা দিতে হইলে, কার্য্যের দ্বারা তাহার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করা কতদূর পর্য্যন্ত কর্ত্তব্য. এবং সেই কার্য্যতঃ উপদেশ কি পর্য্যন্ত ক্রমশালী হইয়া থাকে, বাক্য দ্বারা সহস্র বার উপদেশ করিলে যে উপকার না দর্শে, এক দৃষ্টান্ত প্রদর্শন দ্বারা তাহা অনায়াসেই সিদ্ধ হইতে পারে। বিশেষতঃ অল্পবয়স্ক বালকেরা প্রকৃতিসিদ্ধ প্রবৃত্তি হেতু সততই অনুকরণে রত। বালকগণ স্ব স্ব পিতা-মাতা গুরু সুহৃৎ প্রভৃতি কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগকে যে প্রকার বাক্য কহিতে শ্রবণ করে, সেই রূপ কথা কহিতে অভ্যাস করে; যেরূপ আচার ব্যবহার করিতে দর্শন করে,

সেই রূপ আচার ব্যবহার অনুষ্ঠান করিতে রত হয়, এবং ক্রীড়া কৌতুক হাস্যালাপ ও অপরাপর রীতি নীতির বিষয়েও যেমন প্রত্যক্ষ করে, তাহাই অবলম্বন করিয়া থাকে। পিতামাতা প্রভৃতি গুরুজনদিগের অনুষ্ঠিত কার্য্য সমস্ত যেমন সহজে ও যেমন সত্বরে বালকদিগের স্বভাবে প্রবেশ করে, তাহাদিগের উপদিষ্ট বাক্য সমুদয় কখনই সেরূপ করিতে পারে না। বালকগণ গুরুজনের কার্য্যের অনুকরণ করিতে যে প্রকার রত হয়, তাহাদিগের উপদেশানুসারে কার্য্য করিতে তদ্রূপ হয় না। অব্যাকচিত্ত শিশুগণ যে আপন আপন গুরুজনবর্গের উপদেশ বাক্যাপেক্ষা অনুষ্ঠিত কার্য্যের অধিক অনুগত হয়, এবং তাহাদিগের আচরিত কার্য্যসকল ইচ্ছা পূর্ব্বক অভ্যাস করে, নানা স্থানেই তাহার নিদর্শন বিদ্যমান রহিয়াছে। বিচক্ষণ ব্যক্তি একবার নয়নোন্মীলন করিলেই তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রত্যক্ষ করিতে পারেন।

যে পরিবারের প্রধান পক্ষীয় লোকেরা সর্ব্বদা সৎক্রিয়ার অনুষ্ঠান, সত্য বাক্য ব্যবহার এবং ন্যায় দয়া ও প্রীতি ভক্তি প্রভৃতি উৎকৃষ্ট প্রবৃত্তি সমুদয়ের অনুশীলন করেন, তৎপরিবারস্থ ক্ষুদ্র বালকেরাও তাহার অনুকরণ করিয়া সর্ব্বদা সেইরূপ সাধু অনুষ্ঠানে রত হয়। আর যাহারা সর্ব্বদা অসৎক্রিয়ার অনুষ্ঠান, অসত্য বাক্য ব্যবহার এবং দ্বেষ, হিংসা, দম্ভ, অহঙ্কা-

রাদি কুপ্রবৃত্তি সকলের অনুগত হইয়া নানা প্রকার অধর্ম্ম কর্ম্ম করিয়া থাকে, তাহাদিগের সন্তান সন্ততি এবং শিষ্য প্রভৃতি অনুকারীগণও আপনা হইতে উক্ত প্রকার অধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে অভ্যাস করে। যে পরিবারের প্রধান পক্ষীয় লোকদিগের মধ্যে সর্ব্বদা প্রণয় ও ঐক্যভাব বিরাজ করে, তৎপরিবারস্থ বালক বালিকারাও প্রায় তদনুযায়ী হইয়া আপনারা পরস্পর প্রণয়-ভাবে সম্বন্ধ থাকে, এবং যে গৃহে কর্ত্তৃবর্গের মধ্যে পরস্পর দ্বেষভাব ও অসৎভাব সঞ্চারিত হয়, সে স্থলে বালকেরাও প্রায় তদনুরূপ ভাব ধারণ করে। যে পরিবারের প্রধানবর্গে নিয়ত জ্ঞান বিদ্যার অনুশীলন করিয়াই কালক্ষেপ করে, তত্রস্থ সন্তানগণও সর্ব্বদা বিদ্যানুশীলন করিয়া সুখী হয়। আর যে স্থলে কর্ত্তাদিগের মধ্যে ইন্দ্রিয়-সুখের অধিক প্রাদুর্ভাব, তথায় বালকদিগকেও ইন্দ্রিয়-সুখের উদ্যোগ করিতে দেখা যায়। পানদোষপ্রবল বংশে যে সন্তান জন্মে, সে অতি শৈশবাবস্থা হইতেই মদ্য-পানের অনুকরণ করিতে থাকে। পান দোষাশ্রিত বংশজাত কোন একটি ক্ষুদ্র শিশুকে একদা পানপাত্রে জল পূর্ণ করিয়া মদ্য-পানের অনুকরণ করিতে দেখা গিয়াছে। যে সকল সরলমতি শিশু আপন আপন গুরু জনকে সর্ব্বদা পশুহিংসা ও পশুবধাদি করিয়া আমোদিত হইতে প্রত্যক্ষ করে, তাহারা স্ব স্ব ক্ষমতানুসারে অন্য

পদার্থে পশুপক্ষী আরোপ করিয়া তাহা ছেদন বা কর্ত্তন পূর্ব্বক আপনাদিগের জিঘাংসা বৃত্তিকে চরিতার্থ করে।

অকপটচিত্ত শিশুগণ যে আপন আপন গুরু জনের অনুষ্ঠিত-কার্য্যের অনুকরণ করিতে স্বতঃই রত হয়, এবং অনায়াস পূর্ব্বক তাহা অভ্যাস করে, এইরূপে তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ দর্শান যাইতে পারে। অতএব যাঁহারা আপন আপন পুত্র ও ছাত্রদিগকে ধর্ম্মশিক্ষা প্রদান করিতে অভিলাষ রাখেন, তাঁহাদিগের অগ্রে স্বীয় স্বভাব সংশোধন করা উচিত। আপনি নির্ম্মল না হইলে কখনই অন্যের মালিন্য দূর করা যায় না। যে ব্যক্তি কার্য্য দ্বারা সর্ব্বদা কুকর্ম্মের শিক্ষা প্রদান করে, তাহার মৌখিক ধর্ম্মোপদেশ দ্বারা কি ফল দর্শিবে? ধর্ম্মশিক্ষা কেবল মুখ-ভারতী দ্বারা কখনই সম্পন্ন হয় না, উহাতে কার্য্যানুষ্ঠান আবশ্যক করে। যে ব্যক্তি স্বয়ং সর্ব্বদা অধর্ম্ম-সেবা করিয়া কেবল কথা দ্বারা ছাত্র ও পুত্রদিগকে ধর্ম্মানুগত করিতে অভিলাষ করে, তাহার তুল্য অবোধ আর কেহই নাই। ক্ষেত্রেতে কণ্টকলতার বীজ বপন করিয়া চম্পক পুষ্প প্রাপ্ত হইবার আশা করা যেমন অসম্ভব, তাহার অভিলাষও তদ্রূপ অসঙ্গত। অন্ধব্যক্তি পথপ্রদর্শক হইলে যেমন হাস্যাস্পদ হয়, অধার্ম্মিক লোকে ধর্ম্মশিক্ষা প্রদান করিলে ততোধিক উপহাস-স্থল হইয়া উঠে।

যাঁহারা কার্য্যতঃ নানা প্রকার দুষ্ক্রিয়া অনুষ্ঠান করিয়া পুত্র বা ছাত্রদিগকে ধর্ম্মপরায়ণ সন্দর্শনের আশা বিস্তার করিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহাদিগের আশা চিরকালেই অপূর্ণ থাকিবে যদি স্বয়ং পাপকূপ হইতে গাত্রোত্থান করিতে না পারেন, তবে পুত্রাদিকেই বা কিরূপে কলুষখাত হইতে উদ্ধার করিয়া ধর্ম্মশিখরের চূড়ারূঢ় করিবেন? পুত্রাদি স্নেহপাত্রগণ কোন রূপে দুষ্ক্রিয়ান্বিত না হয়, প্রায় মনুষ্য মাত্রেরই এই ইচ্ছা, কিন্তু অনেকেই আপন কর্ম্মদোষে সে ইচ্ছা চরিতার্থ করিতে পারে না। যে সৎক্রিয়া সর্ব্বত্র সন্দর্শন করিবার ইচ্ছা হয়, তাহা সর্ব্বাগ্রে আপনাতে দৃষ্টি করা কর্ত্তব্য, এবং যে কুক্রিয়া অন্যেতে না থাকিবার প্রার্থনা, তাহা অগ্রে আপনা হইতে দূর করা বিধেয়। স্বয়ং সৎক্রিয়ার অনুষ্ঠাতা না হইয়া সদনুষ্ঠিত হইতে ইচ্ছা করা নিতান্ত অনুচিত। ইক্ষু যদি স্বয়ং মিষ্টরস শূন্য হয, তবে কি আর সে কখন অন্যকে মিষ্ট করিতে পারে? যে ব্যক্তি আপনার মঙ্গলসাধন করিতে অক্ষম, তাহার দ্বারা কি অন্যের কুশল সম্পন্ন হওয়া সম্ভব? কূপ পরিপূর্ণ না হইলে আর তাহার সলিল দ্বারা অন্যত্র প্লাবিত হয না। অতএব যাঁহারা অন্য ব্যক্তিকে ধর্ম্মশিক্ষা প্রদান করিয়া সংসারের মঙ্গল সাধন-ব্রতে ব্রতী হন, তাঁহাদিগের সর্ব্বদা স্বীয় স্বভাবের প্রতি দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। জগতে ধর্ম্ম বিস্তার করি-

বার যে সকল পথ আছে, তন্মধ্যে আপনি ধার্ম্মিক হওয়াই প্রধান। আপনি ধর্ম্মানুগত হইলে যে কেবল আপনারই কুশল হয় এমন নহে, ধর্ম্ম দৃষ্টান্ত প্রদর্শন দ্বারা সংসারেরও হিতসাধন করিতে পারা যায়। সূর্য্য যেমন স্বয়ং জ্যোতিষ্মান হইয়া ব্রহ্মাণ্ডকে জ্যোতির্ম্ময় করে, ধার্ম্মিক ব্যক্তিও সেইরূপ স্বকীয় ধর্ম্ম-প্রভা দ্বারা সমস্ত সংসারকে ধর্ম্মরাগে রঞ্জিত করে। পরম জ্ঞানবান পরমেশ্বর ধর্ম্মাধর্ম্মের সহিত চমৎকার নিয়ম সংস্থাপন করিতেছেন। আপনি ধর্ম্ম-পথের পান্থ হইলে যে সন্তান সন্ততি প্রভৃতিও তদনুগামী হইয়া সেই পথ অবলম্বন পূর্ব্বক আশ্চর্য্য সুখ প্রাপ্ত হয়, ধার্ম্মিকদিগের এই এক পরম পুরস্কার। এবং স্বয়ং ধর্ম্মহীন হইলে যে পুত্র পৌত্রাদিও তদনুগমন করতঃ দারুণ দুঃখ ভোগ করে, অধার্ম্মিকদিগের এই চরম দণ্ড। জগদীশ্বর-প্রণীত এই নিয়ম লঙ্ঘন করাতে অনেক মনুষ্য জগতে পাপপ্রবাহ প্রবাহিত করিয়াছে, এবং অনেকে উক্ত নিয়ম পালন করিয়া সংসারকে ধর্ম্মভূষণে বিভূষিতও করিয়াছে। অনেক ধার্ম্মিক লোক স্বকীয় ধর্ম্ম দৃষ্টান্ত দ্বারা পুত্রাদিকে ধর্ম্মানুগত করিয়া অমৃত ফল ভোগ করিতেছেন, এবং অনেক অধার্ম্মিক মনুষ্য আপন অসৎ দৃষ্টান্তদ্বারা সন্তান সন্ততিকেও অন্যায়পথগামী করিয়া বিষম বিষে জর্জ্জরীভূত হইয়াছে। যে বিখ্যাত ও প্রতিপন্ন পুরুষের

প্রতি বহুজনে দৃষ্টিপাত করিয়া কাল যাপন করে; এবং বহুজনে যাহার অনুকরণে রত হয়, পাপ কর্ম্ম হইতে তাহাকে সর্ব্বদা সতর্ক থাকা উচিত। তাহার পাপাচার বহু ব্যক্তির পাপ ক্রিয়ার কারণ হয়, এবং তাহার পুণ্যতরু অসংখ্য লোককে অমৃত ফল প্রদান করে। যাহা হউক, মানবপ্রকৃতি আলোচনা করিলে প্রতীতি হয় যে ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা সদ্দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করা ধর্ম্মশিক্ষা প্রদানের এক প্রধান উপায়।

৩।—তৃতীয়তঃ সংসর্গ। বালকগণকে বিহিত বিধানে ধর্ম্মশিক্ষা প্রদান করণার্থে সদ্দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করা যেমন আবশ্যক, সেইরূপ তাহাদিগকে সতত সৎসংসর্গে রক্ষা করাও নিতান্ত বিধেয়। সংসর্গের ক্রম দৃষ্টান্ত অপেক্ষা ন্যূন নহে। দৃষ্টান্ত দ্বারা বালকগণ যেমন অনায়াসে উত্তমাধম অবস্থা প্রাপ্ত হয়, সংসর্গ হেতুও সেইরূপ তাহাদিগের উন্নতি ও দুর্গতি ঘটিয়া থাকে। সঙ্গহেতু মূর্খ পণ্ডিত হয়, পণ্ডিত ব্যক্তিও পাণ্ডিত্য শূন্য হয়, ধার্ম্মিক অধার্ম্মিক হয়, দুঃশীল সুশীল হয়, এবং সরল ব্যক্তিও কপটতা অভ্যাস করে, ও কপট লোকেও সরলতা প্রাপ্ত হয়। যে বালকের স্বভাবতঃ দুষ্প্রবৃত্তি সকল উত্তেজিত থাকে, তাহাকেও ক্রমাগত সৎসংসর্গে রক্ষা করিয়া সৎস্বভাবাপন্ন করা যায়, এবং অনেক স[illegible] শান্ত সাধু বালকও কুসংসর্গে লিপ্ত হইয়া [illegible] হয়। সঙ্গলাভের

ইচ্ছা বালককাল হইতেই মনুষ্যমনে প্রদীপ্ত হইতে থাকে। কি বালক, কি যুবা কি বৃদ্ধ, কেহই সতত একাকী কাল যাপন করিয়া সুখী হয় না। যুবা ব্যক্তি যেমন আপন সমবয়স্ক সুহৃদগণের সংসর্গ ভিন্ন থাকিতে পারে না বালকেরাও সেইরূপ এক সমবয়স্ক বালকের সহিত ক্রীড়াদি না করিয়াও স্থির থাকিতে সমর্থ হয় না। কিন্তু যে কএক জন বালক সর্ব্বদা অধিক কাল একত্র বাস করে, তন্মধ্যে যদি অধিকাংশ শিশুর মন্দ-স্বভাব ও কুচরিত্র হয়, তাহা হইলে অবশিষ্ট বালকেরও আপনা হইতে মন্দ স্বভাব হইয়া উঠে। সঙ্গী-দিগের মধ্যে অধিকাংশে যে কার্য্য অনুষ্ঠান বা যে স্বভাব ধারণ করে, অবশিষ্ট ভাগ তাহা না করিয়া কোন মতেই ক্ষান্ত থাকিতে পারে না। সহবাসী সুহৃদদিগের অনুরোধ, বিষম অনুরোধ। সে অনুরোধ বোধ হয়, কেহই হেলন করিতে সমর্থ হয় না, সতত সহচর বান্ধবের সন্তোষার্থে প্রায় কোন ক্রিয়াই অক-র্ত্তব্য থাকে না। সহচরদিগের সন্তোষ জন্য কোন সময় ন্যায় বিসর্জ্জিত হয়, দয়া পরিত্যক্ত হয়, এবং অপরা-পর সকল সাধু কর্ম্মই পরিবর্জ্জিত হইয়া থাকে। সহ-বাসী সুহৃদদিগের অসন্তোষ এমনই অসহ্য যে, লোকে তজ্জন্য আর কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের প্রতি কিছুমাত্র দৃষ্টি-পাত করিতে পারে না। মনুষ্য বরং ধর্ম্মপদবী পরি-ত্যাগ করিতে প্রস্তুত হয় তথাপি সহবাসীদিগের

অসন্তোষ ও অনাদর সহ্য করিতে সাহস করে না। যে কার্য্যের প্রতি নিতান্ত অপ্রবৃত্তি ও অতিশয় অশ্রদ্ধা থাকে, যে কার্য্যকে অতিশয় গর্হিত ও নিন্দিত বলিয়া বোধ হয় যাহার অনুষ্ঠান করা দূরে থাকুক, নাম শ্রবণ মাত্রে ঘৃণা ও লজ্জার উদয় হয়, সমবয়স্ক সঙ্গীদিগের অনুরোধে অনেক ব্যক্তি তদ্রূপ ব্যাপারেও রত হইতে বাধ্য হয়। সতত সহবাসীবর্গের সহিত সমভাবাপন্ন হইবার প্রত্যাশায় কত সুশীল বালক যে ক্রমে দারুণ দুশ্চরিত্রের আধার হইয়া উঠিয়াছে, তাহার সংখ্যা করা সুকঠিন। পৃথিবীতে যত পাপাসক্ত দুঃশীল মনুষ্য বিদ্যমান আছে, বোধ হয় তাহার অধিকাংশই সঙ্গ-জন্য নষ্ট হইয়াছে। প্রথমে যাহার মদ্যপানের প্রতি নিতান্ত দ্বেষ থাকে, এক বিন্দু সুরাস্পর্শ করাকে যে পাপ কর্ম্ম বলিয়া জানে, কিছু দিন পানাসক্ত পুরুষ-দিগের সংসর্গ করিলে, সেও এক জন প্রসিদ্ধ মদ্য-পায়ী হইয়া উঠে। যে সুচরিত্র সাধু পুরুষকে পরস্ত্রী মাতৃবৎ বোধ করিতে দেখা গিয়াছে, লম্পটের সঙ্গ-দোষে সেই ব্যক্তিই আবার বিখ্যাত পরদারাসক্ত বলিয়া দৃষ্ট হইয়াছে। এইরূপ সঙ্গদোষে অনেক সত্যব্রতাবলম্বী মনুষ্য মিথ্যা কথা অভ্যাস করিয়াছে, অনেক সাধু ব্যক্তি চৌর-বৃত্তি অভ্যাস করিয়াছে, এবং অনেক দয়াশীল লোকও ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর হইয়া উঠি-য়াছে। ফলতঃ সঙ্গ হেতু যে কত সাধুস্বভাব মনুষ্য

কত প্রকার অধর্ম্মে লিপ্ত হইয়াছে, এবং কত অসাধু লোক সাধুতা লাভ করিয়াছে, তাহা সম্যক রূপে ব্যক্ত করা সুসাধ্য নহে। যখন সংসর্গ-ফল মনুষ্যের উত্তমাধম ঘটনের প্রতি এরূপ প্রবল কারণ বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে, তখন ঋজুস্বভাব বালকগণকে ধর্ম্ম-শিক্ষা প্রদান করণের জন্য যে সর্ব্বদা উত্তমাধম সঙ্গের বিচার করা নিতান্ত আবশ্যক, তাহাতে আর সন্দেহ কি? সরলস্বভাব শিশুগণ সঙ্গীদিগের মধ্যে দশ জনকে যে কার্য্য করিতে দেখে, তাহার দোষাদোষ বিচার না করিয়াই আপনা হইতে তাহার অনুষ্ঠান আরম্ভ করে, যদিও কোন বালকের প্রকৃতি উত্তম হয়, এবং সহসা কোন কুকর্ম্ম অনুষ্ঠান করিতে সাহস করে না, সঙ্গদোষে তাহারও স্বভাব ক্রমে মলিন হইয়া উঠে, সেই শিশু প্রথমতঃ কেবল সঙ্গীর অনুরোধে নিতান্ত অনিচ্ছা পূর্ব্বক যে কর্ম্মানুষ্ঠান করে, ক্রমাগত দর্শন ও অনুষ্ঠান দ্বারা উক্ত কর্ম্ম তাহার বিলক্ষণ অভ্যস্ত হইয়া যায়, এবং পরিণামে ঐ কুক্রিয়া পরিত্যাগ করা তাহার কঠিন হইয়া উঠে। এইরূপ অনেক প্রকৃত সিদ্ধ উত্তম বালক কুসঙ্গে পড়িয়া অধম হইয়া যায়, কিন্তু সঙ্গদোষে বালকগণ যেমন অনায়াসে অধম হয়, সেই রূপ সঙ্গের গুণে অতি সহজেই উত্তম হইতে সমর্থ হয়। সহবাসী মিত্রগণের প্রণয় ও সমাদর যেমন প্রার্থনীয়, তাহাদের অনাদর ও অশ্রদ্ধাও

সেইরূপ অসহ্য। যেদলের মধ্যে কোন অপকর্ম্ম অ-নুষ্ঠিত হইলে সমুদয় মিত্র একত্রিত হইয়া সেই কুকর্ম্মী বা কুকর্ম্মীদিগকে তিরস্কার ও ভর্ৎসনা করে, সেস্থলে কুক্রিয়ার অনুষ্ঠান হওয়াই অসম্ভব। সহবাসী মিত্রদিগের অনাদর ও ভর্ৎসনা কুকর্ম্মী বালকের পক্ষে যেমন গুরুতর দণ্ড, গুরুজনের শাসন ও শিক্ষকের তাড়না সেরূপ নহে। প্রণয় পরিচিত সহবাসীগণ কুকর্ম্ম-দ্বেষী ও সৎকর্ম্মানুরাগী হইলে লোকের অধর্ম্ম ঘটনা নিতান্ত অসম্ভব। অতএব বালকগণকে ধর্ম্মশিক্ষা প্রদা-নার্থে তাহাদিগকে সর্ব্বদা সৎসংসর্গে রক্ষা করা সর্ব্বতো-ভাবে বিধেয়। যাহাতে বালকগণের কুসংসর্গ ঘটনা না হয় পিতামাতার সেই দিকে সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখা উ-চিত, এবং যাহাতে বিদ্যালয়েও কোন মন্দ সঙ্গ ঘটিতে না পারে, শিক্ষকগণের তাহার প্রতি সর্ব্বতোভাবে মনোযোগ রাখা কর্ত্তব্য।

৪।—চতুর্থতঃ উৎকৃষ্ট বৃত্তির পরিচালন ও নিকৃষ্ট বৃত্তির নিরোধ করণ। যে সকল নিকৃষ্ট বৃত্তি উত্তেজিত হইলে মনুষ্য অধার্ম্মিক হয়, এবং যে সকল উৎকৃষ্ট প্র-বৃত্তি বলবতী হইলে মনুষ্য শিখরে আরোহণ করিতে পারে, অতি শৈশবাবস্থা হইতেই তাহাদিগের কার্য্য আরম্ভ হয়, এবং অতি শিশুকালেই তাহাদিগের হ্রাস বৃদ্ধি প্রকাশ পায়, অতএব ঐ সময় হইতেই বালক গণকে ধর্ম্মশিক্ষা প্রদান করিতে আরম্ভ করা আবশ্যক।

উক্ত সময় ধর্ম্মশিক্ষা প্রদান করিতে আরম্ভ করিলে অতি সহজেই বালকগণকে ধর্ম্ম পথের পথিক করা যাইতে পারে। শৈশবাবস্থা হইতে যাহাদের নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সকল উত্তেজিত হইয়া আইসে এবং উৎকৃষ্ট প্রবৃত্তি গুলি নিস্তেজ হইতে থাকে, পরিণামে তাহাকে উপদেশাদি দ্বারা ধর্ম্মশিক্ষা প্রদান করা অত্যন্ত কঠিন। অতএব যাহাতে বালকের কু প্রবৃত্তি সকল নিস্তেজ হইয়া ধর্ম্ম প্রবৃত্তির অধীন হয় এবং উৎকৃষ্টবৃত্তি সকল ক্রমে প্রবলা হইয়া নিকৃষ্ট বৃত্তি সকলকে যথানিয়মে চালনা করিতে পারে, প্রথম হইতেই পিতামাতার সেই দিকে দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। যে বৃত্তি স্বীয় বিষয় প্রাপ্ত হইয়া সর্ব্বদা চরিতার্থ হয়, তাহাই সমধিক তেজস্বিনী হয়, এবং যাহা পুনঃপুনঃ নিরাশ হয়, সে বৃত্তির আর কিছু মাত্র তেজ থাকে না। যে বালকের স্বাভাবিক ক্রোধাধিক্য, তাহাকে যদি সর্ব্বদা ক্রোধোৎপাদক বিষয় হইতে পৃথক্ রাখা যায় এবং সর্ব্বদা প্রশান্ত ভাবের উপদেশ দেওয়া যায়, তাহা হইলে অবশ্যই দিনে দিনে তাহার ক্রোধ বৃত্তি হীনবল হইতে থাকে; এবং যাহার লোভবৃত্তি প্রবলা বোধ হয়, তাহাকেও ক্রমাগত লোভজনক দ্রব্যাদি না দর্শাইয়া যাহাতে লোভের উদয় না হয়, এমত ভাবে রাখিলে অবশ্যই ক্রমে তাহার ঐ বৃত্তি নিবৃত্তি হইতে থাকে। এইরূপ নিয়ম অবলম্বন করিয়া সকল প্রকার নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিকেই নিরোধ করিতে

পাবা যায, এবং ঐ প্রকারে ধর্ম্ম প্রবৃত্তিরই তেজঃ সা-
ধন করা যাইতে পারে। বিষয় পাইলেই মনোগত
বৃত্তি জাগ্রত হয, এবং বিষযের অভাব হইলেই বৃত্তি-
রও কিঞ্চিৎ তেজ নষ্ট হয। অতএব যে বৃত্তিকে নি-
রোধ করা আবশ্যক এবং যে বালকের যে বৃত্তি স্বভা-
বতঃ উত্তেজিত থাকায তাহার অধর্ম্ম ঘটনার সম্ভবনা,
তাহার সম্মুখে সেই বৃত্তি উত্তেজক বিষয় উপস্থিত
করা অনুচিত. এবং তাহাকে তদ্রূপ অবস্থাতেও রক্ষা
করা অবিধি। আর পুত্রাদির যে সকল ধর্ম্ম প্রবৃত্তি
তেজস্বিনী হইলে তাহাদের পুণ্য সঞ্চার ও পাপত্যাগ
হওয়া সহজ হয, উল্লিখিত উপায দ্বারা পুনঃপুনঃ সেই
সকল প্রবৃত্তিকে মার্জ্জিত ও বর্দ্ধিত করা আবশ্যক।
এইরূপ নিযম অবলম্বন করিয়া প্রথম কাল হইতে বা-
লকগণকে ধর্ম্মশিক্ষা প্রদান করিতে আরম্ভ করিলে
তাহাদিগের ধর্ম্মরত্ন লৌহ সম্পুট অপেক্ষাও দৃঢতর
স্থানে রক্ষিত হয, এবং কস্মিন্ কালেও কোন রূপে
বিনষ্ট বা অপহৃত হইতে পারে না। যে বিজ্ঞ ও বি-
চক্ষণ পিতা বালকের বিদ্যারম্ভ কাল পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা
না করিয়া, প্রথম হইতেই উল্লিখিত নিযমে তাহাকে
ধর্ম্মশিক্ষা প্রদান করিতে আরম্ভ করেন, তাঁহার সন্তা-
নাদি অনায়াসে পবিত্র ধর্ম্মক্ষেত্রে বিচরণ করিতে
পারে, এবং তিনি স্বয়ংও চরমে পরমফল ভোগ
করেন। কোন বালকই এককালে অধম বা উত্তম হয়

না, কেহ ক্রমাগত নিকৃষ্ট বৃত্তি সমুদয়ের অনুগত কার্য্য করিয়া অধঃপতিত হয়, কেহ বা সৎপ্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া ক্রমাগত উন্নতাবস্থায় উপনীত হয়। অতএব প্রথম কাল হইতেই যদি পিতামাতা ও শিক্ষকগণ বালকের মনোবৃত্তির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া তাহাদিগকে যথাযোগ্য রূপে পরিচালিত করেন, তাহা হইলে প্রথম হইতেই বালকের অধর্ম্ম সংঘটন হইবার মূলোৎপাটিত হইয়া যায়, এবং প্রথমাবধিই ধর্ম্মবীজের সংস্থান হইতে থাকে। বালকগণের মনোবৃত্তি সকল প্রথমাবধি যে দিকে অবনত হয়, পরিণামে আর সে দিক্ হইতে বৃত্তির পুনরাবর্ত্তন হওয়া অতি সুকঠিন। অতএব প্রথম হইতেই শিশুদিগের মনোবৃত্তি সকল যথাযোগ্য রূপে পরিচালিত করিয়া ধর্ম্মশিক্ষা প্রদান করিতে আরম্ভ করা বিধেয়। (তত্ত্ববোধিনী ১৭৭৯ শক)

সম্পূর্ণ।